

প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৬৪
সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭

প্রকাশক
জে. এন. সিংহ রায়
নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
২২, ক্যানিং স্ট্রীট
কলিকাতা-১
প্রচ্ছদপট
অজিত গুপ্ত
মুদ্রক
রণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, লোয়ার সারকুলার রোড
কলিকাতা-১৪

সূচী

গল্প লেখার গল্প

বাংলা তেরোশ' পঁয়ত্রিশ সাল। কলেজে পড়ছি বি. এস. সি। অনার্স নিয়েছি অঙ্কে। অঙ্কের মতো এমন আর কি আছে? এত জটিলতায় এমন চুল চেরা নিয়ম! রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা তো অভিনব কাব্য—ছ্যাবলামি, নেকামি, হাল্কা ভাবপ্রবণতার চিহ্নও নেই।

ক্লাশে বসে মুগ্ধ হয়ে লেকচার শুনি, লেবরেটারীতে মশগুল হয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করি: নতুন এক রহস্যময় জগতের হাজার সঙ্কেত মনের মধ্যে ঝিকমিকিয়ে যায়। হাজার নতুন প্রশ্নের ভাবে মন টলমল করে। ছেলেবেলা থেকে 'কেন?' নামক মানসিক রোগে ভুগছি, ছোট বড় সব বিষয়ের মর্মভেদ করার অদম্য আগ্রহ যে রোগের প্রধান লক্ষণ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানা চাই। বিষয় তুচ্ছ হোক, জ্ঞান হিসাবে বিশেষ দাম না থাক, ছেলেমানুষেরও সেটা জানা থাক—যতক্ষণ সেটিকে তুলো ধুনো করে না ঘাঁটছি, হজম করা খাদ্যকে রক্তে মাংসে পরিণত করার মতো পরিণত না করছি উপলব্ধিতে, আমার শান্তি নেই। ক্লাশ এগিয়ে যায় বহুদূর, আমি মেতে থাকি দু'মাস আগে পড়ানো বিদ্যুতের এক অদ্ভুত ব্যবহার নিয়ে। স্বভাব আজও আমার যায়নি। একটু যা পড়ি আর একটু যা শুনি তাই নিয়েই ঘাঁটাঘাঁটি করে আমার সময় যায়—

রাশি রাশি পড়া আর শোনার রীতিমাফিক পড়াশোনা হয়ে ওঠে না।

জ্ঞান সমুদ্রের তীরে একটি উপলখণ্ড কুড়িয়েই গিলে ফেলে আরেকটির দিকে হাত বাড়াতে পারি না—গেলার আগে পরে অনেক রকম প্রক্রিয়া করতে হয়। পাথর হজম করা তো সহজ নয়!

বিজ্ঞান প্রায় সুয়োরাণী হয়ে বসেছিল আমার উপর, শুধু আমার এই স্বভাবের জন্যে আমাকে আয়ত্ত করে উঠতে পারলো না। বৈজ্ঞানিকও হতে পারলাম না, পণ্ডিত ব্যক্তি হওয়াও ঘটে উঠলো না—জীবনটা কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হলো উপন্যাস লিখে।

তখন লিখতে আরম্ভ কবার ইচ্ছা ছিল না—বিজ্ঞানের প্রেমে যখন হাবুডুবু খাচ্ছি। লিখতে শিখে লেখক হবার সাধ কবে জেগেছিল মনে নেই—বোধ হয় ছেলেবেলাতেই, লুকিয়ে লুকিয়ে যখন নিষিদ্ধ বই পড়তাম, তখন। বারো তেরো বছর বয়সের মধ্যে বিষবৃক্ষ, গোরা, চরিত্রহীন পড়া হয়ে গিয়েছে। আর সে কি পড়া! এরকম একখানা বই পড়তাম আর তার ধাক্কা সামলাতে তিনচার দিন মাঠে ঘাটে, গাছে গাছে, নৌকায় নৌকায়, হাটবাজারে মেলায় ঘুরে আর হৈ চৈ মারামারি করে কাটিয়ে তবে সামলে উঠতাম। বড় ঈর্ষা হতো বই যাঁরা লেখেন তাঁদের ওপর। হয়তো সেই ঈর্ষার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল একদিন লেখক হবার চেষ্টা করার সাধ।

লেখক হবার ইচ্ছে সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হইনি। স্কুল জীবনের শেষের দিকে ইচ্ছেটা অল্পে অল্পে নিজের কাছে ধরা পড়েছিল। কিন্তু সে ইচ্ছে হাত মেলেছিল বহু দূরের ভবিষ্যতে—সঙ্গে সঙ্গে লেখবার তাগিদ যোগায়নি। অধিকাংশ স্কুল কলেজে হাতেলেখা মাসিকপত্র থাকে। সারা বাংলায় ছড়ানো গোটা দশেক স্কুলে আর মফস্বল ও কলকাতায় গোটা তিনেক কলেজে আমি পড়েছি। লিখবো?—এই বয়স আমার! বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতা কিছু আমার নেই। কোন্ ভরসায় আমি লিখবো? লেখা তো ছিনিমিনি খেলা নয়! বাড়িতে লুকিয়ে লেখার চেষ্টাও আমি কখন করিনি। আমার অধিকার নেই বলে।

১৩৩৫ সালেও,—যে বছর আমি প্রথম লেখা লিখি,—আমার এ মনোভাব বদলায়নি। বরং আরও স্পষ্ট একটা পরিকল্পনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বয়সের সীমা ঠিক করেছি। তিরিশ বছর বয়সের আগে কারো লেখা উচিত নয়—আমি সেই বয়সে লিখবো। এর মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে হবে সব দিক দিয়ে। কেবল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় নয়। নিশ্চিন্ত মনে যাতে সাহিত্য চর্চা করতে পারি তার বাস্তব ব্যবস্থাগুলিও ঠিক করে ফেলবো।

হ্যাঁ, তখন আমার বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক পড়েছে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? তখনও আমি বিশ্বাস করিনি, আজও বিশ্বাস করি না যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের বিরোধ আছে। তবে এ কথা সত্য যে, কেউ একসঙ্গে

বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক হতে চাইলে তাকে দিয়ে বিজ্ঞান বা সাহিত্য কোনটারই বিশেষ উপকার হয় না। কিন্তু একথাও সত্য যে, এযুগে বিজ্ঞান বাদ দিয়ে সাহিত্য লেখা অসম্ভব—তাতে শুধু পুরানো কুসংস্কারকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। সাহিত্য বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক হলে, তিনি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হিংস্র মানুষের হাতে মারণাস্ত্রই তুলে দেবেন—তাঁর আবিষ্কারকে মানুষ মানুষকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করবে। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সম্বন্ধ এযুগের অতি প্রয়োজনীয় যুগধর্ম।

স্বীকার করছি, ১৩৩৫ সালে এসব তত্ত্বকথা মানতাম না—অস্পষ্ট অনুভূতি ছিল মাত্র। কিন্তু বিজ্ঞান-প্রেমের সঙ্গেই দৃঢ়তর হতো লেখার সঙ্কল্প। কলেজ থেকে তখনকার বালিকা-বালীগঞ্জের বাড়িতে ফিরতাম, আলোহীন পথহীন অসংস্কৃত জলার মতো লেকের ধারে গিয়ে বসতাম—চেনা অচেনা কোন একটি প্রিয়ার মুখ স্মরণ করে একটু চলতি কাব্যরস উপলব্ধি কবার উদ্দেশ্যে। ভেসে আসতো নিজের বাড়ির আত্মীয়-স্বজন আর পাড়াপড়শীর মুখ, জীবনের অকারণ জটিলতায় মুখের চামড়া যাদের কুঁচকে গিয়েছে। ভেসে আসতো স্টেশনে ও ট্রেনে ডেলি প্যাসেঞ্জারদের মুখ—তাদের আলাপ আলোচনা, ভেসে আসতো কলেজে সহপাঠীদের মুখ—শিক্ষার খাঁচায় পোরা তারুণ্য-সিংহের সব শিশু, প্রাণশক্তির অপচয়ের আনন্দে যারা মশগুল। তারপর ভেসে আসতো খালের ধারে

নদীর ধারে, বনের ধারে বসানো গ্রাম—চাষী, মাঝি, জেলে, তাঁতিদের পীড়িত ক্লিষ্ট মুখ। লেকের জনহীন স্তব্ধতা ধ্বনিত হতো ঝিঁঝির ডাকে, শেয়াল ডেকে পৃথিবীকে স্তব্ধতর করে দিতো, তারারা চোখ ঠারতো আকাশের হাজার ট্যারা চোখের মতো, কোনদিন উঠতো চাঁদ। আর ওই মুখগুলি—মধ্যবিত্ত আর চাষা ভূষো—ওই মুখগুলি আমার মধ্যে মুখর অনুভূতি হয়ে চ্যাচাতো—ভাষা দাও—ভাষা দাও।

আমি কি জানি ভাষা দিতে?

একদিন কলেজের কয়েকজন বন্ধু সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছে। শৈলজানন্দ, প্রেমেন, অচিন্ত্য, নজরুল এদের নিয়ে সম্প্রতি হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে—সাহিত্যের দুর্গরক্ষী সিপাইরা কাঠের বন্দুক উঁচিয়ে দুমদাম চীনা পটকা ফাটিয়ে লড়াই শুরু করেছে। আলোচনা গড়াতে গড়াতে এসে ঠেকলো মাসিকপত্রের সম্পাদকদের বুদ্ধিহীনতা, পক্ষপাতিত্ব, দলাদলি প্রবণতা ও উদাসীনতায়।

নাম করা লেখক ছাড়া ওরা কারুর লেখা ছাপায় না। দলের লেখক হলে ছাপায়—ব্যস্। অন্য কেউ পাত্তা পাবে না।

একজনের তিনটি লেখা মাসিকের আপিস থেকে ফেরত এসেছিল। সে সম্পাদকদের কুৎসিত একটা গাল দিলো—কলেজের ছেলেরা যা দেয়। সম্পাদকদের না হোক অন্যদের আমিও যে ধরনের গাল গায়ের জ্বালায় কম বয়েসে দিয়েছি।

লেখকের কথা

তর্কে আমার চিরদিনের বিতৃষ্ণা। অবিবেচক ছেলেটার অন্যায় মন্তব্যে বড় রাগ হলো।

বললাম, 'কেন বাজে কথা বকছো? ভালো লেখা কি এত সস্তা যে, হাতে পেয়েও সম্পাদকেরা ফিরিয়ে দেবেন? মাসিকগুলি তো পড়ো, মাসে ক'টা ভালো গল্প বেরোয় দেখেছো? সম্পাদকেরা কি পাগল যে, ভালো গল্প ফিরিয়ে দিয়ে বাজে গল্প ছাপবে? ভালো দূরে থাক, চলনসই একটা গল্প পেলে সম্পাদকেরা নিশ্চয় সাগ্রহে সেটা ছেপে দেয়।'

খানিক তর্কের পর প্রশ্ন হলো: 'তুমি কি করে জানলে, প্রবোধ?'

প্রবোধ? প্রবোধ আবার কে? পুরানো দিনের কথা বলার কি বিপদ! এখানে আবার বলে নিতে হবে যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল, অফিসিয়াল নাম ছিল শ্রীপ্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—মানিক নামে তাকে ডাকতো শুধু বাড়ির লোক। ডাকনামের কাছে কি করে আসল নাম হার মানলো পরে বলছি।

প্রশ্ন শুনে ভাবলাম, তাই তো! সাধারণ বুদ্ধিতে যা মনে হয়, সেটা তো প্রমাণ নয়! কোনদিন মাসিক বা মাসিকের সম্পাদকের ত্রিসীমানায় যাইনি—কি করে এদের বোঝাবো যে, সম্পাদকেরা ভালো গল্প পেলেই আদর করে ছাপান—এমন কি চলনসই গল্প পর্যন্ত! বললাম, 'আমি জানি।' অনেক কথা কাটাকাটির পর বাজি রাখা হলো। কি বাজি

রাখা হয়েছিল বলবো না—আপনারা হয়তো ভাববেন কলেজে পড়বার সময় ছেলেগুলো এমন বখাটে হয়!

বাজি হলো এই। আমি একটি গল্প লিখে তিন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ, প্রবাসী বা বিচিত্রায় ছাপিয়ে দেবো। যদি না পারি—সে কথা আর কেন?

আমি জানতাম পারবো। কোনদিন এক লাইন লিখিনি, কিন্তু গল্প তো পড়েছি অজস্র। সাহিত্য হবে না, সৃষ্টি হবে না, কিন্তু সম্পাদক ভোলানো গল্প নিশ্চয় হবে। আমি কেন, যে-কেউ চেষ্টা করলেই এরকম গল্প লিখতে পারে।

ভাবতে লাগলাম কি নিয়ে গল্প লিখবো! প্রেমের গল্প? হ্যাঁ, প্রেমের গল্পই লিখতে হবে। বাংলা মাসিকের প্রায় সব গল্পই একরকম প্রেম নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখা হয়। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে, তাদের প্রেম হলো, বিয়েতে বাধা পড়লো, বাধা কেটে মিলন হলো, এই রকম গল্প একটা লিখবো ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে! মন সায় দিলো না। মন বললো, প্রেমের গল্প লিখতে চাও লেখো, কিন্তু পচা দুর্গন্ধ ছ্যাবলামির গল্প লিখো না—বাংলার ছেলেমেয়েগুলো যে গোল্লায় গেল এরকম গল্প পড়ে পড়ে।

আবার বললো মন, কেন, প্রেম কি তুমি দেখোনি সংসারে? এত মেলামেশা করলে মানুষের সঙ্গে? যে প্রেম বাস্তব জগতে দেখেছো—তাকেই ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে স্বপ্ন জগতের প্রেম করে দাও। তাও ভালো হবে ন্যাকামির চেয়ে।

তখন মনে পড়লো পূর্ববঙ্গের এক স্বামী-স্ত্রীর কথা। বাস্তব জীবনে নাটকীয় প্রেমের চরম অভিজ্ঞতা ওদের দেখেই আমি পেয়েছিলাম। স্বামী বাঁশি বাজাতেন। বাঁশের বাঁশি নয়, ক্ল্যারিওনেট। প্রায় পায়ে ধরে তাঁকে আসরে বাজাতে নিয়ে যেতে হতো—গিয়েও খুশি হলে বাজাতেন, নইলে বাজাতেন না। বাড়িতে বাজাতেন—শুধু স্ত্রীকে শ্রোতা রেখে। বছরখানেক আমি শুনেছিলাম। বেশিক্ষণ বাজালে তাঁর গলা দিয়ে রক্ত পড়তো।

এদের অবলম্বন করে এক ঘোরালো ট্র্যাজিক প্লট গড়ে তুলে গল্প লিখলাম। নাম দিলাম অতসী মামী। ভাবলাম, এই উচ্ছ্বাসময় গল্প, এই নিছক পাঠকের মন ভুলানো গল্প, এতে নিজের নাম দেবো না। পরে যখন নিজের নামে ভালো লেখা লিখবো, তখন এই গল্পের কথা তুলে লোকে নিন্দে করবে। এই ভেবে বন্ধু ক'জনকে জানিয়ে, গল্পে নাম দিলাম ডাক নাম—মানিক। কল্পনাশক্তি একটা ভালো ছদ্মনামও খুঁজে পেলো না!

বাংলা মাসের মাঝামাঝি। বিচিত্রা আপিসে গিয়ে গল্পটা দিয়ে এলাম। কার হাতে জানেন? বন্ধুবর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের হাতে। তিনি তখন বিচিত্রায় ছিলেন। আমি অবশ্য তখন চিনতেও পারিনি—পরিচয় হয় পরে।

তারপর দিন গুণছি। বিশ্বাস ঠিক আছে, তবু ভাবছি কবে গল্পটা পিয়ন ফেরত দিয়ে যায়।

মাসের মাঝামাঝি গল্প দিয়েছি—পরের মাসের কাগজে অবশ্যই বার হবে না। তবু ভাবছি, বিচিত্রা বার হলেই দেখতে হবে।

একদিন সকালে ভাবছি, কলেজ যাবো কি যাঁবো না। একজন ভদ্রলোক বাড়িতে এলেন।

তিনি বিচিত্রার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের কর্তব্য সম্পর্কে শত মতবিরোধ সত্ত্বেও যিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমায় স্নেহ করেছেন, বন্ধু হয়ে থেকেছেন।

আমি অবশ্য চিনতাম না। নিজেই পরিচয় দিলেন। এবং আমার 'অতসী মামী' গল্পের জন্য পারিশ্রমিক বাবদ নগদ টাকা হাতে তুলে দিয়ে দাবী জানালেন, আর একটি গল্প চাই।

তারপর সব ওলোট পালট হয়ে গেল। সব ছেড়ে দিয়ে আরম্ভ করলাম লেখা।

হঠাৎ একটা গল্প লিখে মাসিকে ছাপিয়ে কি কেউ লেখক হতে পারে? হাত মক্স করতে হয়—কঠিন সাধনায় জীবনপাত পরিশ্রমে মক্স করতে হয়। কেরানীর রেশি খেটে লিখতে না শিখে জগতে আজ পর্যন্ত একটি ছোট খাটো লেখকও লেখক হতে পারেননি। হঠাৎ কি কেউ লিখতে শেখে, না পারে? সাহিত্য সাধনার জিনিস। এ সাধনার সূত্রপাত কি ভাবে হয় অনেক সাহিত্যিকের জীবনে তার চমকপ্রদ উদাহরণ আছে। আজ সাহিত্যিক মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘প্রথম লেখা’ লিখবার কাহিনীতে তার একটি নমুনা পাবেন।

এখনো আত্মীয়স্বজন আপশোস করেন, ‘তোর দাদা লেখাপড়া শিখে দু’হাজার টাকার চাকরি করছে, তুই কি করলি বলতো, মানিক?—না একটা বাড়ি, না একটা গাড়ি—’

আপনারা কি বলেন?

কেন লিখি

লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই যে-সব কথা জানানো যায় না সেই কথাগুলি জানাবার জন্যই আমি লিখি। অন্য লেখকেরা যাই বলুন, আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, তাঁরা কেন লেখেন সে-প্রশ্নের জবাবও এই।

চিন্তার আশ্রয় মানসিক অভিজ্ঞতা। ছেলেবেলা থেকেই আমার অভিজ্ঞতা অনেকের চেয়ে বেশি। প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণের কথাটা বাজে। আত্মজ্ঞানের অভাব আর রহস্যাবরণের লোভ ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিভাবানেরা কথাটা মেনে নেন। মানসিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও উৎসাহ অথবা নেশা এবং প্রক্রিয়াটির চাপ ও তীব্রতা সহ্য করবার শক্তি অনেকগুলি বিশ্লেষণযোগ্য বোধগম্য কারণে সৃষ্টি হয়, বাড়ে অথবা কমে। আড়াই বছর বয়স থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস আমি মোটামুটি জেনেছি।

লেখার ঝোঁকও অন্য দশটা ঝোঁকের মতোই। অঙ্ক শেখা, যন্ত্র বানানো, শেষ মানে খোঁজা, খেলতে শেখা, গান গাওয়া, টাকা করা ইত্যাদির দলেই লিখতে চাওয়া। লিখতে পারা ওই লিখতে চাওয়ার উগ্রতা আর লিখতে শেখার একাগ্রতার ওপর নির্ভর করে। বক্তব্যের সঞ্চয় থাকা যে দরকার সেটা অবশ্য বলাই বাহুল্য,—দাতব্য উপলব্ধির চাপ ছাড়া লিখতে চাওয়ার উগ্রতা কিসে আনবে!

লেখকের কথা

জীবনকে আমি যে ভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে জানা নয়)। কিন্তু সকলের সঙ্গে আমার জানার এক শব্দার্থক ব্যাপক সমভিত্তি আছে। তাকে আশ্রয় করে আমার খানিকটা উপলব্ধি অন্যকে দান করি।

দান করি বলা ঠিক নয়—পাইয়ে দিই। তাকে উপলব্ধি করাই। আমার লেখাকে আশ্রয় করে সে কতকগুলি মানসিক অভিজ্ঞতা লাভ করে—আমি লিখে পাইয়ে না দিলে বেচারী যা কোনদিন পেতো না। কিন্তু এই কারণে লেখকের অভিমান হওয়া আমার কাছে হাস্যকর ঠেকে। পাওয়ার জন্য অন্যে যত না ব্যাকুল, পাইয়ে দেওয়ার জন্য লেখকের ব্যাকুলতা তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। পাইয়ে দিতে পারলে পাঠকের চেয়ে লেখকের সার্থকতাই বেশি। লেখক নিছক কলম-পেষা মজুর। কলম-পেষা যদি তার কাজে না লাগে তবে রাস্তার ধারে বসে যে মজুর খোয়া ভাঙে তার চেয়েও জীবন তার ব্যর্থ, বেঁচে থাকা নিরর্থক।

কলম-পেষার পেশা বেছে নিয়ে প্রশংসায় আনন্দ পাই বলে দুঃখ নেই, এখনো মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার দুর্বল মুহূর্তে অহংকার বোধ করি বলে আপশোস জাগে যে, খাঁটি লেখক কবে হবো!

সাহিত্য করার আগে

সাহিত্য জীবন আরম্ভ করার একটা গল্প আমি এখানে ওখানে বলেছি। ছাত্র জীবনে বিজ্ঞান শিখতে শিখতে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে 'অতসী মামী' গল্পটি লিখে বিচিত্রায় ছাপানো এবং হঠাৎ এইভাবে সাহিত্য জীবন শুরু করে দেবার গল্প। কিন্তু একটা প্রশ্ন দাঁড়ায় এই : কোন রকম প্রস্তুতি ছাড়াই কি একজন লেখকের সাহিত্য জীবন শুরু হয়ে যেতে পারে ?

আমি বলবো, না, এ রকম হঠাৎ কোন লেখকই গজান না। রাতারাতি লেখকে পরিণত হওয়ার ম্যাজিকে আমি বিশ্বাস করি না। অনেক কাল আগে থেকেই প্রস্তুতি চলে। লেখক হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসতে আসতেই কেবল একজনের পক্ষে হঠাৎ একদিন লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব।

প্রস্তুতির কাজটা অবশ্য লেখক সচেতনভাবে নাও করতে পারেন। কিভাবে যে প্রক্রিয়াটা ঘটছে এ সম্পর্কে তার কোনও ধারণা পর্যন্ত না থাকতে পারে। জীবন যাপনের সমগ্র প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকায় লেখক হবার আগে এই প্রস্তুতি প্রক্রিয়ার বিশেষ তাৎপর্য ধরতে না পারাই স্বাভাবিক।

সাহিত্য জীবন আরম্ভ হওয়ার পর সংস্কার ও স্বপক্ষপাতিত্ব

বর্জন করে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে নিজের অতীত জীবন বিশ্লেষণ করলে প্রস্তুতিটা কিভাবে ঘটেছিল তা কম বেশি জানা প্রত্যেক লেখকের পক্ষে সম্ভব।

সাহিত্য করার আগে কয়েকটা বিষয়ে সকল হবু লেখকের মিল থাকে। যেমন, সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ, জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও জবাব খোঁজার তাগিদ, সাহিত্যে প্রতিফলিত জীবনকে বাস্তব জীবনে খুঁজে নেবার চেষ্টা, নতুন অভিজ্ঞতাকে চিন্তা জগতে সাহিত্যের টেকনিকে ঢেলে সাজা, ইত্যাদি—এ সমস্তই সাহিত্য জীবনের জন্য প্রস্তুতির প্রক্রিয়াটা ঘটাবার কারণ স্বরূপ হয়। দশজনের চেয়ে সাহিত্যকে ঘনিষ্ঠতর গভীরতরভাবে নেওয়ার ফলে চিন্তা ও ভাব জগতে সাহিত্যের প্রভাব সঞ্চিত হয়ে চলে, তার সঙ্গে মিশ্রণ ঘটে নিজের বাস্তব জীবনের সংঘাত ও পরিবেশের প্রভাব, আয়ত্ত করা জ্ঞানের প্রভাব আর সংস্কারের প্রভাব। মোটামুটি এইভাবেই গড়ে ওঠে সাহিত্যিকের চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি।

সাহিত্যের জোরালো প্রভাব ছাড়া সাহিত্যের জন্ম হয় না।

হাতে কলমে না লিখেও চিন্তা জগতে এলোমেলো ছাড়া ছাড়া ভাবে যেন লেখা মক্‌স করার কাজটাই চলে, চিন্তাকে খানিকটা সাহিত্যের টেকনিকে সাজাবার অভ্যাস জন্মে যায়।

একটা কঠিন ও জটিল বিষয়কে আমি শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেলাম। লেখক তৈরি হবার প্রক্রিয়াটা বিশদভাবে ব্যাখ্যা

করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এবার আমি যে আসল কথায় আসছি সেটা স্পষ্ট করার জন্য এইটুকু বলা দরকার ছিল।

সাহিত্যিক হতে হলে বাস্তব জীবনের মতো সাহিত্যকেও অবলম্বন করতে হয়। সাহিত্য না ঘেঁটে, নিজের জানা জীবন সাহিত্যে কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে নিজে যাচাই করে না জেনে এবং প্রতিফলনের কায়দা-কানুন আয়ত্ত না করে সাহিত্যিক হওয়া যায় না। সাহিত্য-সমালোচক হওয়া যায় কিনা তাতেও আমার সন্দেহ আছে!

জীবনকে তো জানতেই হবে, এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু জীবনকে জানাই যথেষ্ট নয়। সাহিত্য কি এবং কেন সে তত্ত্ব শেখাও যথেষ্ট নয়। যে জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি বুঝেছি সেই জীবনটাই সাহিত্যে কিভাবে কতখানি রূপায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে সেটাও সাহিত্যিককে স্পষ্টভাবে জানতে ও বুঝতে হবে, নইলে নতুন সৃষ্টির প্রেরণাও জাগবে না, পথও মুক্ত হবে না।

সমাজ জীবনে কি আছে কি নেই, কি এসেছে আর কি আসছে এটা উপলব্ধি করে দীনতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত করে জীবনকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রামের প্রেরণা জাগবে—সাহিত্যের মাধ্যমে এ সংগ্রাম চালাতে হলে ওই সমাজ জীবনটির সাহিত্যে কি আছে আর কি নেই, কি এসেছে আর কি আসছে সেটাও উপলব্ধি করতেই হবে সাহিত্যিককে।

লিখতে আরম্ভ করার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে

আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আগেও ঘটেছে, মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে সে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করি। আমার লেখায় যে অনেক ভুল, ভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি আছে আগেও আমি তা জানতাম। কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে এতটা স্পষ্ট ও আন্তরিকভাবে জানবার সাধ্য হয়নি। মার্কসবাদ যেটুকু বুঝেছি তাতেই আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে যে, আমার সৃষ্টিতে কত মিথ্যা, বিভ্রান্তি আর আবর্জনা আমি আমদানী করেছি—জীবন ও সাহিত্যকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভালোবেসেও, জীবন ও সাহিত্যকে এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও।

সে তো বটেই। মার্কসবাদই যখন মানবতাকে প্রকৃত অগ্রগতির সঠিক পথ বাতলাতে পারে, অতীত কি ছিল, বর্তমান কি হয়েছে এবং কি ভাবে কোন্ ভবিষ্যৎ আসবে জানিয়ে দিতে পারে তখন মার্কসবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে সাহিত্য করতে গেলে এলোমেলো উল্টোপাল্টা অনেক কিছু তো ঘটবেই।

মার্কসবাদই আবার আমাকে এটাও শিখিয়েছে যে, এজন্য আপশোষ করলেও নিজেকে ধিক্কার দেবার প্রয়োজন নেই। মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে কেন সাহিত্য করতে নেমেছিলাম ভেবে আত্মগ্লানি বোধ করলে সেটা মার্কসবাদের শিক্ষার বিরুদ্ধেই যাবে, যান্ত্রিক একপেশে বিচারে সৃষ্টি হবে আরেকটা বিভ্রান্তির ফাঁদ।

সদিচ্ছা ছিল, নিষ্ঠা ছিল, জীবন ও সাহিত্য থেকেই নতুন সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছিলাম, কিন্তু মার্কসবাদ না জানায় কিছুই করতে পারিনি—এই গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেওয়া মার্কসবাদকে অস্বীকার করারই সমান অপরাধ। নিজের সাহিত্য সম্পর্কেও এ কথা ঘোষণা করার অধিকার আমি পাইনি। জগতে আমি একা মার্কসবাদ না জেনে সাহিত্য চর্চা করিনি—আমার সামান্য লেখার সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যে এঁদের বিপুল সৃষ্টিকে ব্যর্থ আবর্জনা বলে উড়িয়ে দেবার স্পর্ধা আমি কোথায় পাবো ?

প্রকৃতপক্ষে, মার্কসবাদ ঘাঁটতে ঘাঁটতে যখন আমার এতদিনের লেখার ত্রুটি আর দুর্বলতাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, আমার সাহিত্য সৃষ্টি মানুষকে এগিয়ে যেতে এতটুকু সাহায্য করার বদলে আরও বিভ্রান্ত করেছে কিনা সন্দেহ জেগেছিল এবং সোজাসুজি নিজেকে প্রশ্ন করতে হয়েছিল যে, আমার অর্ধেক জীবনের সাধনা কি বাতিল গণ্য করতে হবে ? তখন ওপরের ওই সূত্র ধরেই আমি অকারণ আত্মগ্লানির হাত থেকে রেহাই পাই, অনেক ব্যর্থতা সত্ত্বেও আমার লেখার মূল্য কতটুকু এবং কিসে তা যাচাই করা সম্ভব হয়।

কথাটা বুঝে দেখুন। সূত্রটা কি ? বাংলা সাহিত্যে আমি যেটুকু দিয়েছি সেটুকু বাতিল করার প্রশ্নে আমি ভাবছি বাংলা সাহিত্যকে উড়িয়ে দিতে চাওয়ার স্পর্ধার কথা। এ যেন বিনয়ের ছলে আমার আরেকটা স্পর্ধা প্রকাশ যে,

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র ও পরবর্তী বাংলা সাহিত্য বলতে আমার দানকেও বোঝায়।

কথাটা আমারও মনে হয়েছে বৈকি। কারণ, এটাই তো আসল কথা। বিচার করতে গিয়ে প্রথম প্রশ্নই তাই দাঁড়িয়েছে: আমি নিজের প্রয়োজনে অথবা বাংলা সাহিত্যের প্রয়োজনে সাহিত্য করতে নেমেছিলাম? সাহিত্য করার তাগিদ আমার কি ভাবে আর কেন এসেছিল? সাহিত্যের আদর্শ জানা ছিল না, সমাজ জীবন ও সাহিত্যের সম্পর্ক বুঝতাম না—তবু, জীবন সম্পর্কে একটা দৃষ্টিভঙ্গি আমার নিশ্চয়ই ছিল। সেই দৃষ্টিভঙ্গি কি আমায় সন্ধান দিয়েছিল কিছু নতুন বক্তব্যের—বাংলা সাহিত্যে যা বলা হয়নি?

নেহাত শখের খাতিরে, নাম করা লেখক হবার লোভে সাহিত্য করতে নামিনি সেটা বলাই বাহুল্য। এটুকু সম্বল করে নামলে সাহিত্যিকের বেশি দিন হালে পানি পাবার সাধ্য থাকে না।

ছাত্র বয়সে আমি যখন লেখা শুরু করি তার কয়েক বছর আগে কল্লোল যুগ আরম্ভ হয়েছে।

আমার সাহিত্য করার আগের দিনগুলি দু-ভাগে ভাগ করা যায়। স্কুল থেকে শুরু করে কলেজে প্রথম এক বছর কি দু-বছর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রভাবিত সাহিত্যই ঘেঁটেছি এবং তারপর কতদিন খুব সোরগোলের সঙ্গে

বাংলায় যে 'আধুনিক' সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছিল তার সঙ্গে এবং সেই সাথে হ্যামসুনের 'হাঙ্গার' থেকে শুরু করে শ-র নাটক পর্যন্ত বিদেশী সাহিত্য এবং ফ্রয়েড প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছি।

স্কুল জীবনেই অনেক নভেল পড়েছি। বোধ হয় ফোর্থ ক্লাশ কিম্বা থার্ড ক্লাশ থেকে মানসী ও মর্মবাণী, ভারতবর্ষ এবং প্রবাসী প্রায় নিয়মিত পড়তাম। ভারতবর্ষ এবং প্রবাসীই তখন প্রধানত ছিল বাংলা সাহিত্যের মুখপত্র।

ছেলেবেলা থেকেই গিয়েছিলাম পেকে। অল্প বয়সে 'কেন' রোগের আক্রমণ খুব জোরালো হলে এটা ঘটবেই। ভদ্র জীবনের সীমা পেরিয়ে ঘনিষ্ঠতা জন্মাচ্ছিল নিচের স্তরের দরিদ্র-জীবনের সঙ্গে। উভয় স্তরের জীবনের অসামঞ্জস্য, উভয় স্তরের জীবন সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসাকে স্পষ্ট ও জোরালো করে তুলতো। ভদ্র জীবনে অনেক বাস্তবতা কৃত্রিমতার আড়ালে ঢাকা থাকে, গরীব অশিক্ষিত খাটুয়ে মানুষের সংস্পর্শে এসে ওই বাস্তবতা উলঙ্গ রূপে দেখতে পেতাম, কৃত্রিমতার আবরণটা আমার কাছে ধরা পড়ে যেতো। মধ্যবিত্ত সুখী পরিবারের শত শত আশা-আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকার, শত শত প্রয়োজন না মেটার চরম রূপ দেখতে পেতাম নিচের তলার মানুষের দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনে।

গরীবের রিক্ত বঞ্চিত জীবনের কঠোর উলঙ্গ বাস্তবতা আমার মধ্যবিত্ত ধারণা, বিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাত

করতো—জিজ্ঞাসা জাগতো, তাহলে আসল ব্যাপারটা কি ?

ছাড়া ছাড়া জিজ্ঞাসা—বাস্তবতাকে সমগ্রভাবে দেখবার বা একটা জীবনদর্শন খোঁজার মতো সমগ্র জিজ্ঞাসা খাড়া করবার সাধ্য অবশ্যই তখন ছিল না।

সাহিত্যে কিছু কিছু ইঙ্গিত পেতাম জবাবের। বড়দের জীবন আর সমস্যা নিয়ে লেখা গল্প উপন্যাসে। সেই সঙ্গে সাহিত্য আবার জাগাতো নতুন নতুন জিজ্ঞাসা। জীবনকে বুঝবার জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়তাম গল্প উপন্যাস। গল্প উপন্যাস পড়ে নাড়া খেতাম গভীরভাবে, গল্প উপন্যাসের জীবনকে বুঝবার জন্য ব্যাকুল হয়ে তল্লাশ করতাম বাস্তব জীবন।

স্কুল জীবনেই কয়েকবার 'শ্রীকান্ত' পড়েছিলাম। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে বালক শ্রীকান্তের অ্যাড্‌ভেঞ্চার আমায় বিশেষভাবে নাড়া দেয়নি। আমিও ভয়ানক দুরন্ত আর দুঃসাহসী ছিলাম, অনেক অ্যাড্‌ভেঞ্চারের চিহ্ন সর্বাঙ্গে আছে। বইখানার নরনারীর চরিত্র আর সম্পর্ক আমাকে অভিভূত করে দিয়েছিল। অভিভূত করেছিল কিন্তু আমি ছেড়ে কথা কইনি—আমার একটা বড় জিজ্ঞাসার জবাব আদায় করে ছেড়েছিলাম। পরে শরৎবাবুর চরিত্রহীনেও যার সমর্থন পেয়েছিলাম। আমার জিজ্ঞাসা ছিল প্রেম আর দেহ সম্পর্কিত সমস্যাটা নিয়ে, সাহিত্যের প্রেম আর বাস্তব জীবনের প্রেম নিয়ে সাহিত্যের ছাঁকা প্রেম খুঁজে পেতাম

না মধ্যবিত্তের জীবনে অথবা নিচের তলায়। মধ্যবিত্তের বাস্তব জীবনের প্রেমে যেটুকু ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য দেখতাম তার সন্ধান পেতাম না নিচের তলার জীবনে। আবার নিচের তলার প্রেমে ভাবৈশ্বর্যের রিক্ততা সত্ত্বেও যে সহজ বলিষ্ঠ উন্মাদনা দেখতাম, মধ্যবিত্তের জীবনে তার অভাবটা ধরা পড়তো।

রাজলক্ষ্মীকে দেখলাম, মধ্যবিত্ত সংসারের সেবাময়ী স্নেহময়ী রসময়ী নারীত্বের প্রতিমূর্তি, শুধু সংসারের নিয়ম-নীতি বাধা নিষেধ পরাধীনতার কবল থেকে সে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। নায়িকাকে গৃহের সংকীর্ণতা আর বন্ধন থেকে মুক্ত করে নতুন পরিবেশে আনার জন্যই যে তাদের প্রেমের নতুনত্ব, আসলে এও সাহিত্যেরই ওই ছাঁকা অবাস্তব প্রেম—দেহ নিয়ে ওরা বিব্রত হয়ে না পড়লে, দেহকে এত সমারোহের সঙ্গে বাতিল করা না হলে, ওই বয়সে কথাটা খানিক আঁচ করাও হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। মনটা খুঁত খুঁত করেছিল। বাংলা সাহিত্যে নারীত্ব অভিনব মর্যাদা পেলো, কিন্তু বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে কেন? ঘরের দেওয়াল খসে পড়লে আর সতর্ক পাহারা সরে গেলেও নারী অমানুষ হয়ে যায় না, এই সত্যের সঙ্গে কি বিরোধ আছে বাস্তবের? অথবা এটাই সাহিত্যের রীতি?

চরিত্রহীন আমাকে অভিভূত, বিচলিত করেছিল। বোধহয় আট-দশবার বইখানা পড়েছিলাম তন্ন তন্ন করে। বাংলা সাহিত্যের কত দৃঢ়মূল সংস্কার আর গোঁড়ামি যে চুরমার হয়ে গিয়েছিল এই উপন্যাসে! গল্প উপন্যাসের

নৈতিক আড়ষ্টতা বর্জনের চেষ্টা আরও কয়েকজন নাম করা লেখকও করছিলেন। সাহিত্যে নীতি ও দুর্নীতির প্রশ্ন বিচার করার সাধ্য তখনও ছিল না, কিন্তু মানসিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সেটা খুব স্পষ্টভাবেই সম্পন্ন হতো এবং সেদিনকার সেই ছেলেমানুষি বিচার আজও আমার কাছে অভ্রান্ত হয়ে আছে। শরৎচন্দ্রের বই পড়ে মনে হতো তিনি অন্যায় আর গোঁড়ামিকে আঘাত করেছেন কিন্তু অন্য কোন লেখক সম্পর্কেই এরকম ভাবা সম্ভব হতো না। মনে হতো, তারা যেন অনুচিত জেনেও গায়ের জোরে সেটা উচিত বলে সমর্থন করছেন।

শরৎচন্দ্রের বেলায় কোন প্রশ্ন জাগতো না, কিন্তু অন্য লেখকদের পতিতা, অসতী বা অনুচিত প্রেমকে কেন গ্রহণ করতে পারতাম না, পরে এটা স্পষ্ট হয়েছে। শরৎচন্দ্রের কাহিনীতে পতিতা ও অসতীরা চরিত্র হয়েছে, বড় হয়ে উঠেছে তাদের মনুষ্যত্ব, অনুচিত প্রেমও হয়েছে প্রেম। তখনকার অন্য কোন লেখক এটা পারেননি।

যাই হোক, ছোট বড় লেখকের বই ও মাসিকের লেখা পড়তে পড়তে এই প্রশ্নটাই ক্রমে ক্রমে আরও স্পষ্ট জোরালো হয়ে উঠতে লাগল যে, সাহিত্যে বাস্তবতা আসে না কেন, সাধারণ মানুষ ঠাঁই পায় না কেন? মানুষ হয় ভালো, নয় মন্দ হয়, ভালো-মন্দ মেশানো হয় না কেন? শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিও হৃদয়সর্বস্ব কেন, হৃদয়াবেগ কেন সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে—মধ্যবিত্তের হৃদয়।

ভদ্রজীবনের বিরোধ, ভণ্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা, অবিচার, অনাচার, বিকারগ্রস্ততা, সংস্কার-প্রিয়তা, যান্ত্রিকতা ইত্যাদি তুচ্ছ হয়ে এ মিথ্যা কেন প্রশ্রয় পায় যে ভদ্র জীবন শুধু সুন্দর ও মহৎ ? ভদ্রসমাজের বিকার ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত চাষী-মজুর-মাঝি-মাল্লা-হাড়ি-বাগ্দীদের রুক্ষ কঠোর সংস্কারাছন্ন বিচিত্র জীবন কেন অবহেলিত হয়ে থাকে, কেন এই বিরাট মানবতা—যে একটা অকথ্য অনিয়মের প্রতীক হয়ে আছে মানুষের জগতে—সাহিত্যে স্থান পায় না ?

ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণতা, বাস্তব জীবন ও সাধারণ বাস্তব মানুষের অভাব বড়ই পীড়ন করতো। সংঘাতের পীড়ন।

আমার নিজের জীবনে যে সংঘাত ক্রমে ক্রমে জোরালো হয়ে উঠছিল, সাহিত্য নিয়েও ক্রমে ক্রমে অবিকল সেই সংঘাতের পাল্লায় পড়েছিলাম।

ভদ্র পরিবারে জন্মে পেয়েছি তদনুরূপ হৃদয় আর মন, অথচ ভদ্র জীবনের কৃত্রিমতা, যান্ত্রিক ভাবপ্রবণতা ইত্যাদি অনেক কিছুর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে বিদ্রোহ মাথা তুলেছে আমারই মধ্যে ! আমি নিজে ভাবপ্রবণ অথচ ভাবপ্রবণতার নানা অভিব্যক্তিকে ন্যাকামি বলে চিনে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি। ভদ্রজীবনকে ভালোবাসি, ভদ্র আপনজনদেরই আপন হতে চাই, বন্ধুত্ব করি ভদ্রঘরের ছেলেদের সঙ্গেই, এই জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকে নিজস্ব করে রাখি, অথচ এই জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, প্রকাণ্ড ও

মুখোশ-পরা হীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে।

এই জীবন আমার আপন অথচ এই জীবন থেকেই মাঝে মাঝে পালিয়ে ছোটলোক চাষা ভুষোদের মধ্যে গিয়ে যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। আবার ওই ছোটলোকদের অমার্জিত রিক্ত জীবনের রুক্ষ কঠোর নগ্ন বাস্তবতার চাপে অস্থির হয়ে নিজের জীবনে ফিরে এসে হাঁফ ছাড়ি।

বাড়তে বাড়তে এই সংঘাত প্রথম যৌবনে অবর্ণনীয় প্রচণ্ডতা লাভ করে—লিখতে আরম্ভ করার পর বাস্তবকে স্বীকৃতিদানের ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে এই সংঘাতের তীব্রতা কমে আসে।

মার্কসবাদ আজ আমার এ সংঘাতের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়েছে। এ সংঘাত হলো ভাববাদ ও বস্তুবাদেরই সংঘাত, সমাজ জীবনে আজ যা প্রকট হয়েছে ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে।

সাহিত্য নিয়েও এই রকম সংঘাতের যাঁতাকলে পড়েছিলাম। বাংলা সাহিত্যকে ভালোবাসি, বাস্তবতার উর্ধ্বে তোলা মধ্যবিত্তের হৃদয় মনও ভাবপ্রবণতার প্রতিফলন বলেই এ সাহিত্যকে ভালোবাসি। আমার ভাবকে সরস করে ফেনিয়ে তুলে, কল্পনা স্বপ্নকে আরও রঙদার করে আমাকে মুগ্ধ ও মশগুল করে রাখে বাংলা সাহিত্য। আবার বাস্তবকে না পেয়ে, মধ্যবিত্ত জীবনে কৃত্রিমতা, বিকৃতি ইত্যাদির মুখোশ খুলে না দেওয়ার উদাসীনতা পরোক্ষ প্রশ্রয় হয়ে দাঁড়ানোয়

এবং বাস্তব-ঘেঁষা সতেজ ও বলিষ্ঠ জীবনের অধিকারী মানবতার বিরাট অংশকে ঠাঁই না দেওয়ায়, বড়ই আপসোস আর রাগ হতো।

সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ যেমন দিন দিন বাড়তে থাকে এই আপসোসও তেমনি তীব্র হতে থাকে। একদিকে যে সাহিত্য আমাকে অভিভূত করে ফেলে, আমার চেতনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে, অন্য দিকে সেই সাহিত্যই প্রবল নালিশ জাগায়, তীব্র জ্বালার সঙ্গে ভাবি এব কি প্রতিকার নেই!

এই সংঘাত থেকে সাধ জাগতো যে, আমি একদিন লেখক হবো। নিজেই প্রতিকার করবো।

সাধ ক্রমে ক্রমে পণ হয়ে দাঁড়ায়। লেখক আমি হবোই। কিন্তু যতই হোক, মধ্যবিত্তের মন তো। স্কুল জীবনের লেখক হবার কল্পনা কলেজ জীবনে ক্রমে ক্রমে দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় পরিণত হলেও—সেটা কাজে পরিণত করার কোন চেষ্টাই করতাম না। ভাবতাম এখন নয়, সাহিত্য চর্চা ছেলেমানুষের কাজ নয়। বয়স বাড়ুক, জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা বাড়ুক, পাশ-টাশ করে চাকরি-বাকরি নিয়ে জীবনটাকে গুছিয়ে নিই, তারপর সিরিয়াসলি শুরু করা যাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিযান!

রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করিনি। রবীন্দ্র সাহিত্যও পড়তাম, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস পড়েও আমার মনে কোন প্রশ্ন বা নালিশ জাগতো না। কবি বলে

রবীন্দ্রনাথকে সত্যই আমি রেহাই দিয়েছিলাম। যেমন তাঁর 'কাবুলীওয়ালা' গল্প পড়ে সত্যই এ কথা আমার মনে হয়নি যে কাবুলীওয়ালাকে তিনি শুধু স্নেহশীল পিতা হিসাবেই দেখলেন, অমন কত স্নেহশীল গরীব পিতার নিরুপায় পিতাকে সে যে কেমন জোঁকের মতো শোষণ করে সেটা তাঁর চোখে ধরা পড়লো না!

বাংলা সাহিত্যে বস্তুবাদের আবির্ভাবকে সাহায্য করার দায়িত্ব থেকে আজ আমি তাঁকে রেহাই দিই। কেন দিই, সেটা এ প্রবন্ধে বলা সম্ভব নয়।

সাহিত্য করার আগের দিনের দ্বিতীয় ভাগটা প্রধানত প্রথম ভাগটারই জের ও পরিণতি।

বাংলা সাহিত্যে কল্লোল, কালি-কলমীয় ধারা অর্থাৎ যাকে বলা হতো 'আধুনিক সাহিত্য' এবং যাকে আধুনিক সাহিত্যিকেরা 'বস্তুপন্থী' বলে দাবি করতেন—এই ধারাকে আমি কি ভাবে গ্রহণ করেছিলাম এটাই প্রধান কথা।

প্রসঙ্গক্রমে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, আমি ছিলাম বিজ্ঞানের ছাত্র এবং যেমন আগ্রহ নিয়ে বিজ্ঞান পড়তাম তেমনি আগ্রহ নিয়েই আরম্ভ করেছিলাম যৌনবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব আর বিশ্বসাহিত্য পড়া।

সাহিত্যে ওই 'আধুনিক' মার্কা ধারাটা এসেছিল প্রচণ্ড সোরগোল তুলে, প্রায় একটা বিপ্লব মার্কা বিদ্রোহের রূপ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে সাহিত্যের অন্যান্য দিক্‌পালেরা সচকিত হয়ে উঠেছিলেন তারুণ্যের এই

বলগাহীন সাহিত্যিক অভিযানে, বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল।

অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক আত্মসমর্পণ করেছিলেন এই দুরন্ত বন্যার কাছে, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আশীর্বাদ করেছিলেন এবং সাহিত্যে 'আধুনিকতা'র কচি কচি নেতাকে নিমন্ত্রণ করে আলাপ ও ভাব করেছিলেন—পাছে এরা বাংলা সাহিত্যের অনেক কিছু ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁকেও ছিন্ন ভিন্ন করে উড়িয়ে দেয়। দু'-একজন তাল ঠুকেছিল। একজন কবি রবীন্দ্রনাথকে 'ডোণ্ট কেয়ার' করার কবিতা পর্যন্ত লিখেছিল।

কোনো দেশে কোনো কালে খ্যাতনামা কবি বা সাহিত্যিককে গুণ্ডার মতো সোজাসুজি আক্রমণে ঘায়েল করে যেন কেউ কবি বা সাহিত্যিক হতে পেরেছে!

বন্ধু বান্ধবেরা খ্যাতি দিয়ে কি কোন কবি বা সাহিত্যিককে খ্যাতনামা করতে পারে? খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিক মানেই জনসাধারণ সমগ্র বা আংশিকভাবে, স্থায়ীভাবে অথবা সাময়িকভাবে যাকে তারিফ করছে। এদের ভূমিসাৎ করে কাব্যসাহিত্যের মোড় ঘুরানো যায় না। কাব্য সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়েই এদের ভূমিসাৎ করতে হয়।

বাংলা সাহিত্যে এই আধুনিকতা একটা বিপ্লবের তোড়জোড় বেঁধেই এসেছিল কিন্তু বিপ্লব হয়নি, হওয়া সম্ভবও ছিল না—সাহিত্যের চলতি সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত তারুণ্যের বিক্ষোভ বিপ্লব এনে দিতে পারে না।

জোরের সঙ্গে দাবি করা হয়েছিল যে, আমরা বস্তুপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি করছি, কিন্তু প্রকৃত বস্তুবাদী আদর্শ কল্লোল, কালি-কলমীয় সাহিত্যিক অভিযানের পিছনে ছিল না।

সচেতনভাবে বস্তুবাদের আদর্শ অবলম্বন করে নয়, বাস্তবতাই মধ্যবিত্তের জীবনে ও চেতনায় ভাববাদ ও বস্তুবাদের যে সংঘাত সৃষ্টি করেছিল, যে সংঘাত আমার জীবনে ও চেতনায় প্রকট হয়েছিল, সাহিত্যে তারই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি হিসাবে দেখা দিয়েছিল এই বিদ্রোহ।

১৩৩৩ সালের 'কালি কলমে' সাহিত্যের নতুন অভিযানের স্বপক্ষে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি চিঠি ছাপা হয়। তিনি লিখছেন "জীবনকে দেখবার পাঠ নিতে যদি হ্যামসুন গোর্কির পাঠশালায় গিয়ে থাকি তাতে দোষ কি……গোর্কি-হ্যামসুনের জগতে এলে ইউক্লিডেরা ফাঁপরে পড়ে! এ যে একেবারে মগের মুলুক! এ যে জীবনের জটিল দুর্বোধ্য জগৎ!"

চিঠিখানায় আরও কয়েকবার 'হ্যামসুন-গোর্কি'র নামোল্লেখ আছে। প্রেমেনবাবুর ছোট একখানা চিঠিতে সাহিত্যে নতুন বিদ্রোহের স্বরূপ যেন ধরা দিয়েছে, বেশি দূর হাতড়াতে হয় না। বাংলা সাহিত্যে জীবন নেই, সব কিছুই গণিতের নিয়মে ছকে বাঁধা প্রাণহীন ব্যাপার। হ্যামসুন-গোর্কির মগের মুলুকে পরিণত করতে হবে বাংলা সাহিত্যকে!

হ্যামসুনের দু'-একখানা বই পড়েছিলাম। প্রেমেনবাবুর এই চিঠি পড়ে গোর্কির সঙ্গে প্রথম পরিচয় করতে যাই।

মনে আছে, 'মাদার' পড়তে পড়তে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম—হ্যামসুন আর গোর্কিকে প্রেমেনবাবু মেলাবেন কি করে?

আমার তখন হ্যামসুনেও আপত্তি ছিল না, গোর্কিতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু ভাবের আকাশের ঝড় আর মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যার পার্থক্য কি ধরা না পড়ে পারে?

অসীম আগ্রহ নিয়ে আধুনিকদের লেখা পড়ি। ভাষার তীক্ষ্ণতা, ভঙ্গির নতুনত্ব, নতুন মানুষ ও পরিবেশের আমদানী, নরনারীর রোমান্টিক সম্পর্ককে বাস্তব করে তোলার দুঃসাহসী চেষ্টা আশা ও উল্লাস জাগায়—তারই পাশাপাশি হালকা নোংরা রোমান্টিক ন্যাকামি তীব্র বিতৃষ্ণা জাগায়।

বিতৃষ্ণা জাগাতো কিন্তু খুব বেশি বিচলিত হতাম না। জীবনের কতগুলি বাস্তব নিয়মে আমার বিশ্বাস ছিল। তখনই আমি জানতাম যে, সমাজে যেমন সাহিত্যেও তেমনি বড় একটা আলোড়ন দেখা দিলে সেই সুযোগে কতকগুলি চ্যাংড়া কিছু ফাজলামি জুড়বেই—আসল আন্দোলনটা যদি ঠিক থাকে এই সব হালকা ছ্যাবলামির জন্য বিশেষ কিছু আসবে যাবে না।

শনিবারের চিঠির 'হায় হায়, সব গেল' আর্তনাদ অকারণ এবং হাস্যকর মনে হতো। সুযোগ পেয়ে কয়েকজন বাজে মানুষ খানিকটা নোংরামি এবং ন্যাকামি করেই যদি একটা দেশের সাহিত্যকে গোল্লায় পাঠাতে পারে, তবে সে সাহিত্যের গোল্লায় যাওয়া উচিত।

'আধুনিকতা'র আন্দোলন যদি শৈলজানন্দের খাঁটি গ্রামের মানুষ আর কয়লাখনির কুলিদের সাহিত্যে আনা সম্ভব করে থাকে, বস্তির জীবনকে অন্তত সাহিত্যে প্রবেশের পথ করে দিয়ে থাকে,—শুধু এইজন্যই রাশিকৃত জঞ্জালের আবির্ভাবটা ক্ষমা করা চলে।

আশা করেছিলাম অনেক কিন্তু ক্রমে ক্রমে টের পেলাম সাহিত্যে যে অভাব, যে অসম্পূর্ণতা, আমাকে তীব্রভাবে পীড়ন করছে তার পূরণ হচ্ছে না। শৈলজানন্দের গ্রাম্য জীবন ও কয়লা খনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ—কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এই বাস্তব সংঘাত আসেনি। বস্তি জীবন এসেছে কিন্তু বস্তি জীবনের বাস্তবতা আসেনি—বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তেরই রোমান্টিক ভাবাবেগ। মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা আসেনি, দেহ বড় হয়ে উঠলেও মধ্যবিত্তের অবাস্তব রোমান্টিক প্রেম বাতিল হয়নি, ওই একই রোমান্স শুধু দেহকে আশ্রয় করে খানিকটা অন্যভাবে রূপায়িত হয়েছে।

শৈশব থেকে সারা বাংলার গ্রামে শহরে ঘুরে যে জীবন দেখেছি, নিজের জীবনের বিরোধ ও সংঘাতের কঠোর চাপে ভাবালুতার আবরণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে জীবনের যে কঠোর নগ্ন বাস্তব রূপ দেখেছি—সাহিত্যে কি তা আসবে না? এই বাস্তব জীবন যাদের—সেই সাধারণ বাস্তব মানুষ?

অথচ প্রথম গল্পই আমি লিখি 'অতসী মামী'—রোমান্সে

ঠাসা অবাস্তব কাহিনী। কিন্তু এ গল্প সাহিত্য করার জন্য লিখিনি—লিখেছিলাম বিখ্যাত মাসিকে গল্প ছাপানো নিয়ে তর্কে জিতবার জন্য। এ গল্পে তাই নিজের আসল নাম দিইনি, ডাক নাম 'মানিক' দিয়েছিলাম।

কিন্তু পরেও কি রোমান্টিক কাহিনী আমি লিখিনি—কোমর বেঁধে যখন লিখতে আরম্ভ করেছি? লিখেছি বৈকি, 'দিবারাত্রির কাব্য' তার চরম নিদর্শন!

যে সংঘাতের কথা বলছি—এও তারই প্রমাণ। ভাববাদ যদি একেবারে বর্জন করতেই পারতাম—তবে আর সংঘাত থাকতো কিসের!

সচেতনভাবে বস্তুবাদের আদর্শ গ্রহণ করে সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্য করিনি বটে—কিন্তু ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাহিত্যে আমাকে বাস্তবকে অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল। কোন সুনির্দিষ্ট জীবনাদর্শ দিতে পারিনি কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অভাব খানিকটা মিটিয়েছি নিশ্চয়।

তারও প্রয়োজন ছিল বৈকি। অন্তত খাঁটি বস্তুবাদী জীবনাদর্শ গ্রহণ করার স্তরে উঠবার একটা ধাপ হিসাবে।

লেখকের সমস্যা

গল্প উপন্যাসের লেখক-লেখিকার জীবিকার প্রশ্নটা সব দেশে সমান সমস্যা নয়—কোন কোন দেশে এটা কোন সমস্যাই নয়।

লেখক নাম করা না হলেও যে ভাষায় লেখা একখানা বই-এর ভালো বলে নাম হলে হাজার হাজার কপি হু হু করে বিক্রি হয়ে যায়, সেই ভাষার লেখককে স্বভাবতঃই জীবিকার জন্য চিন্তা করতে হয় না। অথবা যে দেশে প্রতিভার পরিচয় দিলে লেখকের জীবিকার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে সে দেশেও এ চিন্তার প্রয়োজন হয় না।

জীবিকাটা সাহিত্যিকের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় বাংলার মতো দেশে যেখানে বিখ্যাত লেখকের নাম করা বই-এর বিক্রি এত কম এবং বিক্রিটাও এমন ধীরে সুস্থে এতদিন ধরে হয় যে, চার পাঁচখানা নাম করা বই লেখার পরেও লেখকের জীবিকার সমস্যা ঘোচে না। বাংলায় তবু লিখে কিছু পয়সা মেলে, ভারতে অনেক প্রাদেশিক ভাষার লেখকদের লেখা থেকে একরকম কিছুই জোটে না।

বাংলার সমস্যাটাই একটু নাড়াচাড়া করা যাক। সত্যই কি নাম করার পরেও বাংলায় শুধু লিখে দিন চালানো যায় না? যায়। লেখাকে পেশায় পরিণত করলে অর্থাৎ

সাহিত্যিকের পালনীয় প্রথম ও প্রধান নীতিটা বাতিল করে দিয়ে নিজেকে পেশাদার লেখকে পরিণত করলে সপরিবারে মোটামুটি বেঁচে থাকার মতো অর্থ উপার্জন করা যায়।

সাহিত্যের আদর্শ বিক্রয় করে, আত্মবিক্রয় করে করা যায়। এইজন্যই তো জীবিকাটা সমস্যা। নইলে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য লড়াই করতে করতে নাম হলে অনেক দিকেই আত্মবিক্রয়ের সুযোগ সাহিত্যিকের জুটে যায়।

শিল্প সাহিত্যকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করলে খাঁটি শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না—আমি এই মূলনীতির কথাই বলছি। স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক টাকার জন্য লিখলে লেখকের ক্ষমতা অনুসারে লেখার যে মান হওয়া উচিত লেখা তার চেয়ে নিচু স্তরের হয়ে যাবেই। সকল সাহিত্যিকের পক্ষে এই নীতি প্রযোজ্য।

এই নীতিটাকে 'আর্ট ফর আর্টস সেক' দুর্নীতিটার সঙ্গে অনেকে একাকার করে ফেলেন। টাকার জন্য না লেখার মানে দাঁড় করান নিছক সাহিত্যের জন্য সাহিত্য করা! এটা ভুল ধারণা। মূলনীতিটা মোটেই ফাঁকা আদর্শবাদিতা থেকে আসে না। খাঁটি বাস্তব কারণেই নিজের সাধ্যমতো খাঁটি সাহিত্য সৃষ্টি করতে চাইলে সাহিত্যিককে এই নীতি মানতে হয়।

সাহিত্যকে পেশা করা মাত্র সাহিত্যিক তার সাহিত্য চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা অনেকখানিই হারিয়ে ফেলেন। যথেষ্ট সময় দিয়ে এবং অন্য হিসাব না করে এবং

নিজের জীবন দর্শনের সত্যটিকে রূপায়িত করার স্বাধীনতা সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। কতটা সময় দিয়ে কতটা লিখলে পেট চলবে শুধু এই হিসাব নয়, যারা তাকে পেট চালাবার টাকা দেবে তারা তার বক্তব্য কিভাবে নেবে এই ভাবনাও ভাবতে হয়।

বাস্তবতাটা একটু খোলসা করি।

যে সমাজে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সাহিত্যিক তার আওতার বাইরে যেতে পারেন না,—এই নির্ভুল যুক্তি থেকে নির্ভুল সিদ্ধান্ত আসে যে মালিকানা স্বার্থের সমাজে সাহিত্যিক মজুরি নিয়েই শ্রম বিক্রয় করেন।

সাহিত্যকে পেশা করা না করার প্রশ্নে এই সঠিক সিদ্ধান্ত যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করতে গিয়ে অনেকে কিন্তু বেঠিক সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছান। সাহিত্যকে পেশা করা কেন উচিত নয় তার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করান: সাহিত্যিক মালিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার উপযোগী সাহিত্য রচনা না করলে মালিকশ্রেণী তাকে বাঁচার মতো মজুরি দেবে না। কাজেই, সাহিত্য করে বাঁচতে চাইলে মালিকশ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে প্রচার করতেই হবে।

কি অপরূপ ছেলেমানুষী যুক্তি! মালিকের মুনাফার জন্য খাটলে, মজুর কেরানী খেটে যাওয়ার জন্য কোন মতে বেঁচে থাকার মতো মজুরি পান বলেই মজুর কেরানীরা যেন মালিকদের মুনাফার দায় ঘাড়ে নিয়ে মালিকশ্রেণীর পক্ষ নিয়ে খাটেন!

বেঁচে থাকার মতো মজুরি নিয়ে খাটলেই যেন তাই সাহিত্যিককে মালিকশ্রেণীর পক্ষ নিতে হবে!

কোনও দেশে কোনও কালে মজুর মালিকের স্বার্থে খাটেনি।

মজুর কেরানীর মতো কোন মতে বাঁচার মতো মজুরি নিয়ে খেটে পেশাদার সাহিত্যিক হলে তার খাটুনিটা কেন মালিকশ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে প্রচার হতেই হবে?

এই কারণে সাহিত্যিকের কেন পেশাদার হওয়া চলবে না? মজুর কেরানীর মতোই তো তিনি শুধু তার শ্রমটুকু বিক্রি করবেন, পক্ষপাতিত্ব নয়।

মজুর বেচেন কায়িক শ্রম। কেরানীও প্রায় তাই। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই মাথার কাজ বারবার করে যেতে যেতে সেটা আর মাথার কাজ থাকে না, মজুরের কায়িক শ্রমে দেহ ক্ষয় করার ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়ায় মর্চে ধরে দেহ ক্ষয় করার কায়িক পরিশ্রমে দাঁড়িয়ে যায়।

কায়িক শ্রম আর মানসিক শ্রমের মধ্যে কৃত্রিম গুণগত ও মূলগত তারতম্য দু' রকম শ্রমের মজুরিদাতারাই সৃষ্টি করেছে। কিন্তু মজুরিদাতাদের কেরামতি হলেও ইতিহাসের সুনিয়মিত ধারার অঙ্গ হিসাবেই অনিয়মও সাময়িক বাস্তবতার মর্যাদা পায়। সমসাময়িক অবস্থার সুযোগ নিয়ে জুয়াড়ীর মরি-বাঁচি প্রাণান্তকর চেষ্টায় একটা যুদ্ধ বাধিয়ে মুনাফা বেলুনের মতো ফাঁপিয়ে তোলাও যেমন একটা সর্বগ্রাসী সাময়িক বাস্তবতা হয়ে ওঠে।

পক্ষপাতিত্ব বিক্রয় না করে শুধু শ্রমটুকু বিক্রয় করে একজন অল্প বেতনের কেরানীর মতো বেঁচে থাকতে চেয়ে সাহিত্যকে পেশা করা কেন অপরাধ হবে সাহিত্যিকের?

অপরাধ হবে এইজন্য যে, লেখক মজুর বা অল্প বেতনের কেরানী নন, শ্রমটাই তাঁর একমাত্র পণ্য নয়। তাঁর পক্ষপাতিত্বের মূল্য এত বেশি যে, তাঁর শ্রমের মূল্য বিচার তুচ্ছ হয়ে যায়।

লেখকের পক্ষপাতিত্বের মূল্য কিন্তু তার শ্রম দিয়েই নির্ধারিত হয়। লেখকের শ্রম এমন এক ধরনের যে, সেটা খাটুনির ঘণ্টার হিসাবে বা উৎপন্ন পণ্যের হিসাবে মাপা যায় না।

নিজস্ব একটা জীবন-দর্শন ছাড়া সাহিত্যিক হওয়া সম্ভব নয়। এইজন্য তাঁর শুধু বসে বসে লেখার বা প্রুফ সংশোধন করার শ্রম নয়—সব সময় সর্বত্র জীবনকে দর্শন করার বিরামহীন শ্রমও তাকে চালাতে হয়।

একটা উদাহরণ দিই।

লেখক একপোয়া মাছ কিনতে বাজারে গিয়েছেন। আজকের দিনে ওটুকু মাছ কিনতে বাজারে যেতে পারাটাই সৌভাগ্য সন্দেহ নেই—সেটা শ্রম নয়। কিন্তু দরদস্তুর করে একপো মাছ কিনেই কি রেহাই আছে লেখকের? সতর্ক চোখ মেলে তাকে দেখতেই হবে অন্য কারা মাছ কিনতে এসেছে, কেমন মানুষেরা কিভাবে কতটা মাছ কিনছে, যদি পোষায় তবেই একটু কিনবে বলে কারা শুধু মাছের দরই

জিজ্ঞাসা করে চলেছে ঘুরে ঘুরে, তেল ছোঁয়ানো কড়ায় পোড়া পোড়া করে খাবার জন্য কারা কিনছে পচন-ধরা সস্তা মাছ, কারা এসেছে শুধু ফেলে দেওয়া কাঁটাকুটো কাণকো কুড়োতে !

মাছের বাজারে যারা এসেছে তাদের সঙ্গে মিলিয়ে মনের চোখে তাদেরও দেখে নিতে হয় যারা এ বাজারে কদাচিৎ আসে, যারা একেবারেই আসে না।

এত দেখেও কি রেহাই আছে ? মাছ যারা বেচছে তাদেরও তো দেখতে হবে ! মেছুনীটির পরনে কি শাড়ি, হাতের সোনার বালা ছাড়াও কোন অঙ্গে কি গয়না ইত্যাদি থেকে শুরু করে তার বসাব, মাছ কাটার, কথা বলার ভঙ্গির খুঁটিনাটি না দেখে রাখলে তো ওর কাছ থেকে কেনা মাছ অন্দরের যে বৌটি কেটেকুটে রান্না করবে তাকে এবং একে পৃথক ও সম্পূর্ণ একটা জীবন্ত মানুষ হিসাবে মনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না কলম চালাবার সময়। দু'জনেই স্ত্রীলোক, একজন বাজারে মাছ বেচে, আরেকজন বাড়ির মধ্যে রান্নাঘরে সেই মাছ রাঁধে—শুধু এইটুকু দেখে আর জেনে তো লেখকের চলে না।

ঘরে শিল্প-সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুঁজি ঘাঁটা আর ঘরে বাইরে সর্বত্র সব সময় মানুষকে আর জীবনকে তন্ন তন্ন করে দেখা ও জানা এবং মনের মধ্যে তাই নিয়ে তোলপাড় করা, যোগ বিয়োগ করা, মিলিয়ে দেখা আর অমিল খোঁজা ও সব কিছুর মানে বোঝার চেষ্টা—লেখকের বিরামহীন এই

শ্রম মাপাই বা হবে কিসে, দামই বা কষা হবে কোন নিরিখে?

শ্রমটা লেখকের ধাতে দাঁড়িয়ে যায়। পুরোই হোক আর খানিকটাই হোক, এরকম ধাত ছাড়া লেখক হওয়া যায় না। কিন্তু সাধনা ধাতস্থ হলেও সেটা শ্রম বৈকি।

সহজেই বোঝা যায়, যে সমাজে লেখকের এই শ্রমের মূল্য দেবার ব্যবস্থা নেই, সে সমাজে লেখাকে পেশা করার অর্থ শুধু কলম চালিয়ে লেখার শ্রমটুকু পণ্য করা। জীবিকার জন্য লেখার শ্রমটার উপর নির্ভর করলে স্বভাবতঃই এই শ্রমটাই প্রধান হয়ে উঠবে, সাধনার শ্রমটা গুরুত্ব হারাবে।

যত বড়ই প্রতিভা থাক, সাধনায় ঢিল পড়ার অর্থই লেখক ও লেখার অধঃপতন।

বাংলার বিশেষ বাস্তব অবস্থায় প্রক্রিয়াটা কিভাবে ঘটে দেখা যাক।

প্রথমেই বলে রাখি লেখক বলতে আমি শুধু সৎ ও আদর্শনিষ্ঠ লেখকদেরই ধরছি, পুরস্কার ও সুবিধার বিনিময়ে অর্থাৎ সোজাসুজি ঘুষ খেয়ে যারা নাম ও প্রতিভা, জনসাধারণের শোষকদের স্বার্থে স্বেচ্ছায় কাজে লাগান তাদের নয়।

একজন গরীব বাঙালী লেখক। সাময়িকপত্রে লেখার দক্ষিণা এবং বই-এর রয়ালটিই তার প্রধান আয়। সাময়িকপত্রের মালিক লেখা ছেপে এবং প্রকাশক বই ছেপে টাকা দেন বলে অনেকের একটা ভুল ধারণা

আছে যে, নামকরা লেখকেরও সাহিত্যকে পেশা করার ওরাই বোধ হয় প্রধান অন্তরায়। সাহিত্যকে পেশা করলে বাধ্য হয়ে কাগজের মালিক ও প্রকাশকের মন যুগিয়ে সাহিত্য করতে হবে—এইজন্যই সাহিত্যকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা চলে না।

নামকরা লেখকের কাছে কাগজের মালিক ও প্রকাশক সত্যই সমস্যা—কিন্তু সমস্যাটা এই নয় যে, তাঁকে ওঁদের মন যুগিয়ে সাহিত্য করতে হবে। এদের সম্পর্কিত সমস্যাটা হলো সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অর্থাৎ দেনা পাওনার ব্যাপার। লেখকের নাম থাকলে এবং বই বিক্রি হলে বিশেষ গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত দু'চারজন ছাড়া নিজেদের স্বার্থেই কাগজের মালিক তাঁর লেখা ছাপবেন এবং প্রকাশক বই প্রকাশ করবেন।

এঁদের নিয়ে ফ্যাসাদ হলো এই যে, কাগজের মালিকের চেষ্টা যত পারা যায় কম টাকা দিয়ে ভালো লেখা আদায় করা আর প্রকাশকের চেষ্টা লেখকের ন্যায্য পাওনা ফাঁকি দেওয়া। সব প্রকাশক যে গোপনে চুক্তির চেয়ে বেশি বই ছাপিয়ে নিয়ে এই ধরনের জুয়াচুরি করে লেখককে ঠকান তা নয়। হিসাবপত্র ঠিক থাকা সত্ত্বেও নানাভাবে লেখক ফাঁকিতে পড়ে যান। যেমন, একখানা বই-এর সংস্করণ ফুরিয়ে গেল কিন্তু প্রকাশক অন্য কয়েকখানা বই ছাপছেন, কয়েক মাসের মধ্যে আরেকখানা বেশি বই প্রকাশ করার সুবিধে নেই—সংস্করণ শেষ হওয়ার খবরটা প্রকাশক স্রেফ চেপে যাবেন। বইটার

নতুন সংস্করণের জন্য পাওনা টাকাটা লেখক পাবেন অনেক দেরিতে।

সাহিত্যকে পেশা করলে লেখককে কম বেশি মন যোগাতে হয় পাঠক পাঠিকার! বাংলার পাঠক পাঠিকারাই পেশাদার সাহিত্যিকের লেখার স্বাধীনতা হরণ করেন। কাগজের মালিক ও প্রকাশকের মারফতে আসলে তারাই তো লেখককে পয়সা দেন।

এই সহজ বাস্তবতাটুকু খেয়াল না করায় অনেকেই সাহিত্যিকের শ্রমের প্রকৃত স্বরূপ এবং সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক সঠিক ধরতে পারেন না। লেখককে সাধারণভাবে 'বুদ্ধিজীবী' আখ্যা দিয়ে কেরানী শিক্ষক ইত্যাদির সঙ্গে একাকার করে দেওয়া হয়।

লেখক বুদ্ধিজীবী কিন্তু বেতনভোগী বুদ্ধিজীবী নয়—তিনি বুদ্ধিজীবী উৎপাদক। বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি সাহিত্য উৎপাদন করেন এবং নিজেই হোক বা অংশীদার প্রকাশকের সাহায্যেই হোক তাকে সম্পূর্ণ পণ্যের রূপ দিয়ে বাজারে ছাড়েন।

সাহিত্যিককে বুদ্ধিজীবী উৎপাদন হিসাবে না ধরলে সাহিত্য সাধনার প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি ও অর্থনৈতিক দিকটার বাস্তবতা ধারণা করা সম্ভব নয়।

উৎপাদক বলেই তার সম্পর্কটা ক্রেতার সঙ্গে। বাজারে চললেই উৎপণ্য পণ্যের অর্থনৈতিক সার্থকতা। কাজেই সাহিত্যের চাহিদাটাই পেশাদার সাহিত্যিকের কাছে প্রধান কথা হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলার পাঠকশ্রেণী নানা স্তরে ভাগ করা। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র রূপটাও তাই অতি বিচিত্র। চালু সাময়িক পত্রিকাগুলি একসঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই এই বিচিত্র রূপ ধরা পড়বে। এই কারণেই সেকেলে ধাঁচের লেখা থেকে প্রগতিশীল লেখা পর্যন্ত পাঁচমিশেলী লেখা যে পত্রিকায় মেলে তার বিক্রিই সবচেয়ে বেশি!

বাংলার পেশাদার সাহিত্যিকের অবস্থাটা কি দাঁড়ায়? আগেই বলেছি সাময়িকপত্রের দক্ষিণা সামান্য। টাকার জন্য তাই অনেকগুলি কাগজে তাকে লিখতে হবে। বই বিক্রি হয় কম—সুতরাং বেশি বইও তাকে লিখতে হবে।

দু'দিক দিয়ে তার ফল হবে মারাত্মক।

নাম আছে সুতরাং কাগজের মালিকের কথা না ভাবলেও চলে—কিন্তু ওই যে পাঁচখানা কাগজের পাঁচরকম রুচির পাঠক পাঠিকা, তাদের রুচির কথা না ভাবলে তো চলবে না! পাঁচরকমের পাঁচমিশেলী লেখার খিচুড়ি সাহিত্যে বোঝাই পত্রিকাটির বিক্রির মধ্যে যে বাস্তব সত্যের প্রকাশ তাকে খাতির না করলে অর্থাৎ বেশি সংখ্যক লোকের কাছে রুচিকর হয়, খানিকটা এই ধরনের বই না লিখলে তো চলবে না!

ব্যস্, খতম হয়ে গেল লেখকের স্বাধীন সৃষ্টির স্বাধীনতা!

এই গেল ক্রেতা বাড়াবার জন্য নিজের চেতনা ও প্রতিভার যোগ্য ব্যবহার ছাঁটাই করার দিক! অন্য দিকটা হলো বেশি বেশি লিখতে বাধ্য হওয়ার দিক।

হলেন বা নাম-করা লেখক, নতুন চিন্তা আর অভিজ্ঞতার কতই বা তার পুঁজি! পুঁজি খরচ করে বই লিখে তবেই তো নাম-করা লেখক হয়েছেন! পুঁজি ফুরিয়ে গেলে উপায়? পুঁজি বাড়াবার উপায় নেই, বেশি লিখে নতুন চিন্তা ও অভিজ্ঞতার পুঁজি সঞ্চয় করার সময় কই!

অগত্যা বলা কথাই আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নতুনভাবে বলার চেষ্টা।

ব্যস্, খতম হয়ে গেল সাহিত্য সাধনা।

'পেশাদার' সাহিত্যিক বলে তাই কোন জীব হয় না। যে 'পেশাদার' সে সাহিত্যিক নয়। পৃথিবীর সর্বত্র এই নিয়ম। যে দেশে প্রচুর সাহিত্য বিক্রি হয়, নাম হলে লেখকের জীবিকার চিন্তা করতে হয় না—বাংলা দেশের সাহিত্যিকের সঙ্গে সে দেশের সাহিত্যিকের তফাত শুধু এই যে, পেটের চিন্তায় বিব্রত না হয়ে অকাজে সময় নষ্ট না করে সাহিত্যিক সাহিত্য-সাধনা চালিয়ে যেতে পারেন।

টাকার জন্য লিখলে সে দেশের সাহিত্যিকের ও সাহিত্যের অপমৃত্যু অবধারিত। সাহিত্য সৃষ্টি করে যে অর্থ মেলে তাতে সন্তুষ্ট না থেকে বেশি টাকা চাওয়া মানে এ ক্ষেত্রেও ক্রেতার মন যোগানো এবং বেশি লেখা।

বহুদিন ধরে অনেক বই লেখার পর পুরানো বইয়ের নতুন নতুন সংস্করণ হওয়া, সিনেমা রাইট বিক্রি হওয়া ইত্যাদি কারণে কোন বিশেষ সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে হয়তো

জীবিকার জন্য অন্য কিছু না করলেও চলে এটা কিন্তু মূলনীতির ব্যতিক্রমের নিদর্শন নয়। বাংলা দেশে শুধু লিখে কোন সাহিত্যিকের জীবিকা জোটে না এ নীতি এখানেও খাটছে।

বাস্তবতা ঠিকভাবে বিচার করে প্রয়োগ না করলে নীতির যান্ত্রিক প্রয়োগের আশঙ্কা থাকে। টাকার জন্য হলে খাঁটি সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না—এই নীতি থেকে কারো কারো বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তে পৌঁছান আশ্চর্য নয় যে টাকার জন্য সাহিত্যিকের লেখাটাই নিষিদ্ধ, টাকার জন্য লিখলেই সাহিত্যিকের পতন ঘটে।

সাহিত্য জীবিকা দেয় না মানেই বাংলায় সাহিত্যিক অন্যভাবে জীবিকার জন্য পরিশ্রম ও সময় খরচ করতে বাধ্য। চাকরি করুন, জীবনবীমার দালালী করুন, জিনিষ ফিরি করুন—বাঁচার জন্য একটা কিছু সাহিত্যিককে করতেই হবে। এ বাস্তবতা মানতেই হবে।

আপিসে কলম পিষতে পারলে টাকার জন্য সাহিত্যিক লিখতে পারবেন না কেন? যে কাজ করে তাঁর অভ্যাস আছে, যে কাজের কলাকৌশল ভালোভাবে আয়ত্ত করা আছে, অন্য কাজের বদলে সে কাজ করলে অপরাধ কি?

ফাঁকা আদর্শবাদিতা থেকে, ভাববাদী আদর্শ নিষ্ঠার অনমনীয় সংস্কার থেকে এই মনোভাব আসে।

জীবিকার জন্য সাহিত্য না করার নীতিতে অবিচলিত থাকার জন্যই জীবিকার জন্য লেখককে যে শ্রম ও সময়

দিতেই হবে, সেই শ্রম আর সময় টাকার জন্য লেখার কাজে দিলে শুধু যে দোষ হয় না তা নয়, দেওয়াটাই লেখকের কর্তব্য। বিশেষত বাংলা দেশের বিশেষ সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থায়।

পিছিয়ে থাকা মানুষদের জন্য যে পত্রিকা সেই পত্রিকায় খানিকটা তাদের গ্রহণের উপযোগী করে লেখা দিলে ক্ষতিটা কার? আমার হিসাবে তো লাভটাই ষোল আনা। মানুষকে এগিয়ে নেবার জন্য যাঁর সাহিত্য সাধনা, জীবিকার প্রয়োজনে লেখা হয়ে থাকলেও ঐ লেখায় কি কিছু কিছু নতুন কথা থাকবে না, নতুন চেতনা পরিবেশিত হবে না? পিছিয়ে পড়া পাঠক পাঠিকার চেতনায় নতুনের ছোঁয়াচ লাগবে না?

খাঁটি সাহিত্যিক ওই পত্রিকায় না লিখলে বেচারীরা আরও কতদিন ওই আলোটুকু থেকেও বঞ্চিত হয়ে থাকবে কে জানে!

প্রশ্ন উঠবে: বাস্তবে এটা করা কি সম্ভব লেখকের পক্ষে? সাহিত্য সাধনা ঠিকমতো বজায় রেখে জীবিকার জন্য অন্য কাজে যতটা সময় আর পরিশ্রম দিতে হতো হিসাব করে শুধু সেইটুকুই অন্যরকম লেখার জন্য দেওয়া? বেশি লেখার একঘেয়েমি এসে যাবে না তার আসল সৃষ্টিতে? আরও লিখে পয়সা করে একটু স্বাচ্ছন্দ্যের লোভ জাগবে না তার?

এসব ছেলেমানুষী সংশয় ও প্রশ্ন। কঠোর নিষ্ঠার

সঙ্গে যে সাহিত্যিক মূলনীতি পালন করতে পারবেন তার কাছে এটুকু কি আশা করা যাবে না যে, তিনি জীবিকা আর পিছানো মানুষকে জীবন ও সাহিত্যের নতুন দিগন্তের সন্ধান দেবার মিলিত উদ্দেশ্যে কতটা কলম চালাবেন, সে বিষয়ে নিয়ম রাখতে পারবেন! দশটা পাঁচটা আপিস করা, অন্যভাবে জীবিকা অর্জনের ক্লান্তি কি সাহিত্য চর্চার কম বিঘ্ন? নিজের নিয়ম ও সুবিধামতো লেখার কাজ করে সাহিত্যিক বরং দেশের পশ্চাৎপদ মানুষের জন্য সাহিত্যিক কর্তব্য পালনের উদ্দীপনা পাবেন। স্বাচ্ছন্দ্যের লোভ যাকে সহজে কাবু করবে নীতি ও আদর্শের প্রতি তার নিষ্ঠার কোন প্রশ্নই তো ওঠে না!

সাহিত্যিকের আসল মুস্কিলটা বরং হবে অন্যরকম। সাধারণ ও পিছানো মানুষের জন্য লেখা পড়ে সমালোচক, বন্ধুবান্ধব ও বিদগ্ধ পাঠক সোরগোল তুলবেন; তুমি বাজে লেখা লিখছ! কিন্তু নিন্দা বা প্রশংসায় বিচলিত হলে বস্তুবাদী সাহিত্যিকের চলবে কেন?

প্রতিভা

প্রতিভা সম্পর্কে সাধারণ লোকের—এবং স্বয়ং প্রতিভাবানদেরও—ধারণা আছে ওটা এক ঈশ্বরদত্ত রহস্যময় জিনিস। প্রতিভাকে এরকম রহস্যময় পদার্থ মনে করার ফলে লেখক-কবিদের এ জিনিসটার ওপর প্রায় একচেটিয়া অধিকার জন্মে গিয়েছে। বড় বৈজ্ঞানিকের 'বৈজ্ঞানিক প্রতিভা' থাকে কিন্তু বড় একজন কবি নিজেই প্রতিভা। বৈজ্ঞানিকের বেলা প্রতিভার অর্থ বিশেষ ক্ষমতা, কবির বেলা প্রতিভার অর্থ দুর্বোধ্য একটা গুণ। এর কারণটা অনুমান করা সহজ—লেখক-কবিদের সাধারণ লোক মানুষের পঙক্তি থেকে তফাতে সরিয়ে এক বিশেষ শ্রেণীর রহস্যময় জীব করে রেখেছে। এরকম ধারণা সৃষ্টির জন্য দায়ী অবশ্য লেখক-কবিরাই।

কিন্তু সেটা কে খেয়াল রাখে? লেখক-কবিরা তো খুশি হয়ে গর্বের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধে সাধারণের এই ধারণাকে গ্রহণ করে নিজেদের সম্পর্কে নিজেদের ধারণায় পরিণত করে নিয়েছেন—তাঁদের প্রতিভা স্বতন্ত্র, অন্য সবরকম গুণী থেকে তাঁরা পৃথক। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, নেতা, গায়ক, অভিনেতা, চিত্রশিল্পী সকলে গুণী—লেখক-কবি গুণীর মধ্যে গুণী, তাঁর জাতই আলাদা। তা, একথা কে অস্বীকার করবে

যে, ছবি আঁকতে পারা আর কবিতা লিখতে পারা দু'রকমের গুণ। লেখক-কবিরা এটুকু মানতেও রাজী নন। ছবি আঁকা যদি গুণ হয়, তবে কবিতা গল্প-লেখা গুণই নয়, দুর্লভ দুর্বোধ্য একটা কিছু! কেন, মানুষ কি যুগ যুগ ধরে মেনে আসছে না সাধারণ কোন সংজ্ঞাই তাঁদের প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে না?

তাঁরা ঠিক মানুষ নন, তাঁদের প্রতিভার মানে নেই। অথচ, কথাটা যে কি সাংঘাতিক তলিয়ে বুঝতে গেলে গা শিউরে উঠবে!

যুগ যুগ ধরে মানুষের রহস্যময় অন্তর্লোকের সন্ধান জানিয়ে জানিয়ে, সাধারণ বুদ্ধিতে অগম্য অনাগত ভবিষ্যৎকে অনুভূতির সঙ্কেতে প্রকাশ করে করে, হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দ বেদনার হিল্লোল জাগিয়ে জাগিয়ে এবং নিজেকে সযত্নে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রেখে ও মাঝে মাঝে শুধু অসাধারণ অলোকসামান্য কথাবার্তা চালচলন ব্যবহারের মধ্যে খানিক খানিক্ আত্মপ্রকাশ করে জনতার মধ্যে নিজেদের সম্পর্কে যে মিথ্যা মোহ, ভ্রান্তধারণা বহুকাল ধরে লেখক-কবিরা সৃষ্টি করে এসেছেন, আজ বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার যুগে সেই জালে আটক পড়ে তাঁদের বিপদের সীমা নেই। কাব্য সাহিত্যের আসরে পর্যন্ত বিজ্ঞান এসে জুড়ে বসছে, ঠুনকো রঙীন কাঁচের মতো ভেঙে পড়ছে ঈশ্বরের দুর্গের দেয়াল থেকে কাব্যলক্ষ্মীর অন্দরমহলের দেয়াল, জীবন থেকে ঝেঁটিয়ে সাফ করা হচ্ছে ভ্রান্তির জঞ্জাল, বৈজ্ঞানিক

দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া আজ আর কলম ধরার উপায় নেই। কিন্তু পুরুত-মোল্লা-পাদরীদের মতো লেখক-কবিদের হয়েছে বিষম বিপদ। যুগ যুগ ধরে সযত্নে সৃষ্টি করা জনতার যে সংস্কার ভিত্তি করে এতকাল তাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন, আজ নিজের হাতে কেমন করে সে ভিত্তি ভেঙে দেবেন, দাঁড়াবেন কোথায়! ভিত্তি কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে, কে ঠেকাবে? নতুন ভিত্তিও তৈরি হচ্ছে। জনতার যে সংস্কারের প্রতিক্রিয়া ছিল, লেখক-কবিরও পুরনো সংস্কার, একটাতে ভাঙন ধরার সঙ্গে স্বভাবতঃই অন্যটাতেও ভাঙন ধরে। কিন্তু সমস্যা এখনো মেটেনি—এখনই বরং সমস্যাটার সবচেয়ে উৎকট অবস্থা। জনতার পুরনো ধারণা ভাঙতে শুরু করায় গোড়ার দিকে বরং লেখক-কবির পক্ষে সম্ভব ছিল নিজের ধারণা না বদলিয়েও পুরনো কায়দাতেই জনতাকে খুশি রাখা—গণ-বিক্ষোভের গোড়ার দিকে যেমন রাজা মহারাজা মালিকের পক্ষেও দেশভক্ত সেজে জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে জনতাকে খুশি করা সম্ভব। আজ আর সে অবস্থা নেই। আজ লেখক-কবিকে নিজের সম্পর্কে নিজেরই পুরনো ধারণা ও বিশ্বাস ছেঁটে ফেলতেই হবে, নতুবা তাঁর ব্যবসা চলে না।

মনের জগতে জনসাধারণকে মোহগ্রস্ত প্রজা করে রেখে পরম মাননীয় রাজা সেজে রাজত্ব করা আজ অসম্ভব হয়ে গিয়েছে। রাজসিংহাসন ত্যাগ করে রাজার মনোভাব নিয়ে নেতা হবার পর্যন্ত উপায় নেই।

মানুষের সমাজে নিজেদের আজ মানুষ বলেই ভাবতে হবে, প্রতিভাকে দেখতে হবে প্রতিভা বলেই। আজ তাই লেখক-কবির পক্ষেও দরকার হয়ে পড়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে নিজেকে আর নিজের প্রতিভাকে যাচাই করা—সত্য যেমনি হোক অভিমানে কাতর না হয়ে তা মেনে নিতে হবে। মাথা নিচু করে এই মূল সত্যটিকে মেনে নিতে হবে যে, কবিতা লেখাও কাজ, ছবি আঁকাও কাজ, গান করাও কাজ, চাকা ঘোরানোও কাজ, তাঁত চালানোও কাজ এবং কাজের দক্ষতা শুধু কাজেরই দক্ষতা—মানুষ হয়ে জন্মে কারো সাধ্য নেই অমানুষিক প্রতিভার পরিচয় দিয়ে অতিমানব হয়ে যাবে। কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি!

তবে হ্যাঁ, কাজের তারতম্য আছে। দক্ষতারও তারতম্য আছে। শুধু এইটুকু।

প্রতিভা ওই দক্ষতা অর্জনের বিশেষ ক্ষমতা। আর কিছুই নয়।

কোন বিশেষ প্রতিভা নিয়ে কেউ জন্মায় না। ভ্রূণে প্রতিভার বীজ—অর্থাৎ বিশেষ দক্ষতার জন্য বিশেষ শক্তি অর্জনের যে ভবিষ্যৎ পরিণতি তার সম্ভাবনা—থাকতে পারে কিন্তু ওটা নিছক বীজ। এবং এমনই বীজ যে তা কোন্ নির্দিষ্ট গাছে পরিণত হবে সেটা অনির্দিষ্টই থাকে। সাধারণ গাছের বেলায় তা অনির্দিষ্ট নয়,—বীজটা বট গাছেরই তবে কিনা দেখে চিনতে পারা যাচ্ছে না। প্রতিভার বেলায় অন্য। সে বীজ থেকে যে-কোন গাছ হতে পারে।

আঁতুড়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখে কারো পক্ষে বলে দেওয়াই অসম্ভব ছিল যে, এককালে তিনি প্রতিভাবান কবি হবেন ; শুধু তাই নয়, কবিই যে তিনি হবেন এমন কোনো সুনির্দিষ্ট সম্ভাবনাই ছিল না। আইনস্টাইন হতে পারতেন, জওহরলাল হতে পারতেন—আবার কিছু নাও হতে পারতেন ! কবিতা লেখায় দক্ষতা অর্জনের পথে তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয়েছে পরে, তাঁরই জীবনযাপনের সর্বাঙ্গীন প্রক্রিয়ার মধ্যে।

আসল কথাটা এই : দুটি জিনিস নিয়ে প্রতিভা—দেহের উপকরণাদির উৎকর্ষ এবং আঁতুড় থেকে (হয়তো ভ্রূণের অবস্থা থেকেই—ভ্রূণের ওপর মায়ের মারফতে বাইরের প্রভাব কতটা হয় এখনো বেশি জানা যায়নি) প্রতিটি মুহূর্তের প্রভাব—ঘরের বাইরের কাজের অকাজের প্রত্যেক মুহূর্ত। সব মিলিয়ে এই প্রভাব কিভাবে একদিকে হৃদয় মনের বিশেষ গড়ন দেয় আর অন্যদিকে হৃদয়-মনের চলতি ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, আজকের অসম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞান তার যতগুলি নিয়মকানুন আবিষ্কার করেছে প্রতিভার স্বরূপ জানার পক্ষে আজ তাই যথেষ্ট। শিশুকাল থেকে দুরন্ত অবাধ্য অমনোযোগী ছেলে হঠাৎ বদলে গিয়ে যখন অসাধারণ প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকে পরিণত হয় তখন স্বভাবতঃই আমাদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়—বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা ছেলেটির মধ্যে 'লুকিয়ে' ছিল, যেদিন থেকে সে ভালো ছেলে হয়েছিল সেদিন থেকে ওই প্রতিভার বিকাশ শুরু হয়।

কিন্তু খুঁজলে দেখা যাবে প্রতিভার বিকাশ তার হচ্ছিল ছেলেবেলা থেকেই, যতই দুরন্ত হোক আর স্কুলের পড়ায় মন দিতে না চাক, মন তার জিজ্ঞাসু হয়েই উঠছিল ক্রমে ক্রমে, জবাব পাবার জিদটাও চড়ছিল দিন দিন। মানুষ বদলায় কিন্তু হঠাৎ বদলায় না, হঠাৎ কোন যোগাযোগে বদলাবার প্রেরণাটাই শুধু আসা সম্ভব। বদলটাও শুধু এই নীতিতেই ঘটতে পারে যে, ছেলেটির গাছের ডালে পাখির বাসায় কি আছে খুঁজে বার করবার প্রবৃত্তিটা বইয়ে কি লেখা আছে জানবার ইচ্ছায় এবং তা থেকে অণু ভেঙে লুকনো শক্তি কি করে বার করা যায় তার পরীক্ষা করার সাধে পরিণত হতে পারে। মানুষ কেন হাসে কাঁদে ভালোবাসে ঘৃণা করে জানবার সাধ জেগে দার্শনিক বা কবি বা লেখকও ছেলেটি হতে পারতো।

অবশ্য শুধু জিজ্ঞাসু মন নয়, আরও অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতো তার প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক বা কবি-লেখক হওয়াটা। প্রতিভাবিহীনদের চেয়ে খানিকটা বেশি মস্তিষ্ক থাকারও প্রয়োজন হতো। জন্মাবামাত্র রবীন্দ্রনাথ কিংবা আইনস্টাইনের স্থানে আরেকটি নবজাত শিশুকে এনে বসিয়ে দিলে এবং সে এক তিল এদিক ওদিক না করে অবিকল ওদের জীবনের অনুকরণ করে বড় হলেই যে একদিন রবীন্দ্রনাথ বা আইনস্টাইন হয়ে উঠতো তা নয়। অণুগুলি যেভাবে সংযোজন করে দেহটি গঠিত হয়েছে,—সেটুকুকেও যদি প্রতিভার ঈশ্বরদত্ত দিক বলা হয়, আমি তাও

মানতে রাজী হবো না—পূর্বপুরুষদত্ত এই বিশেষণ প্রয়োগ করবো।

প্রতিভা আসলে এক। বৈজ্ঞানিক আর কবির প্রতিভার মৌলিক পার্থক্য কিছুই নেই—পার্থক্য শুধু বিকাশ আর প্রকাশে। স্কুলে কলেজে লেবরেটরিতে বৈজ্ঞানিকের শিক্ষা, গবেষণা, আবিষ্কার। জীবনের স্কুলে লেখক-কবির শিক্ষা, হৃদয়মনের লেবরেটরিতে চিন্তা আর অনুভূতিকে শব্দে রূপান্তরিত করার পরীক্ষা, কবিতা সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিকের কাজে মনের চর্চাটা বেশি, লেখক-কবির হৃদয়ের চর্চা। প্রতিভার যা মূল কথা, মনোনিবেশের শক্তি, সেটা কারো কম নয়। লেখক-কবির কাজে যে হৃদয়টা বেশি লাগে বলেছি ওটা শুধু কথার কথা, আসলে সবই মনের খেলা। মনের কতকগুলি বিশেষ ব্যাপারকেই হৃদয় বলা হয়, হৃদয় বলে স্বতন্ত্র কোন পদার্থই নেই। বুকের যেখানটায় হৃদয় আছে বলা হয়, বিশেষ অবস্থায় যেখানটা টন টন বা ধুপ্ ধুপ্ করে, সেখানে শরীরের একটা বিশেষ অংশ অবস্থা বিশেষে কমবেশি সাড়া দেয়—ব্যথা, না ভয়, না প্রেম কিসে সাড়া দিলো না জেনেই। মন বলি বা বুদ্ধি বলি বা মস্তিষ্ক বলি, বৈজ্ঞানিকও সেটাই খাটান, কবিও সেটাই খাটান—নিজের নিজের কাজে। চিন্তায় মগ্ন বৈজ্ঞানিক আর লেখায় মগ্ন লেখক-কবির আশেপাশের জগৎ ভুলে যাওয়া মগ্নতা, সাধারণ জীবনে অন্যমনস্ক ভাব, ইত্যাদি এক জিনিস।

আজ লেখক-কবি বৈজ্ঞানিকের আরও ঘনিষ্ঠ হওয়া নয়,

একাকার হয়ে যাবার দিন এসেছে। জনতার তাই দাবি। লেবরেটরিতে পরমাণুর শক্তিকে মুক্তি দিতে পারার মধ্যেই বৈজ্ঞানিককে তার কর্তব্য শেষ করতে দিতে মানুষ আর রাজী নয়। মানুষ আজ দাবি করতে শুরু করেছে, আণবিক বোমা নয়, তোমার ওই পরমাণুর শক্তি আমার কি কাজে লাগে বাৎলিয়ে দাও। বৈজ্ঞানিক টের পাচ্ছেন, দাবি হুকুম হয়ে উঠলো বলে,—সে হুকুম অমান্য করা চলবে না। নিছক বৈজ্ঞানিক হয়ে থাকা আর চলবে না বেশি দিন, লেখক-কবির মতো মানুষকে ভালোবাসতে শিখতে হবে, গবেষণার খাতিরে গবেষণা চালাতে হবে। আর লেখক-কবিও টের পাচ্ছেন যে, নিছক হাসি-কান্নার আরক আর ভূমার মূলধনে প্রেম চলবে না মানুষের সঙ্গে, বৈজ্ঞানিকের মতো মানুষেব রোগ উপবাস লডাই নিয়ে গবেষণা করা ছাড়া উপায় নেই।

সেজন্য নিজেকে সাধারণ মানুষ ভাবা ছাড়াও আমার পথ নেই। জনসাধারণ সাধারণ আর আমি অসাধারণ, কারণ আমি লেখক, এ ধারণা নিয়ে ভালোবাসতে গেলে মানুষ কাছে ঘেঁষতে দেবে না, মানবপ্রেমে বুক ফেটে যাওয়া বেদনার সৃষ্টিও গ্রহণ করবে না। তাই সাহিত্যে প্রগতি আনার খাতিরে, গণসাহিত্য সৃষ্টির জন্য প্রাণের ছটফটানি মেটানোর জন্য অগত্যাই আজ সবার আগে লেখক-কবিকে এই চিন্তাটা স্বভাবে পরিণত করতে হবে—আমি দশ জনের একজন।

তাতে দোষের কিছু নেই। প্রতিভাও তো জনসাধারণের

সম্পত্তি। জনসাধারণ না থাকলে কারখানার উৎপাদনের যেমন মানে হয় না, প্রতিভার উৎপাদনও তেমনি অর্থহীন হয়ে যায়। প্রতিভার মালিককে জনসাধারণ কত যে শ্রদ্ধা সম্মান দিয়েছে তার সীমা হয় না, ভবিষ্যতেও চিরকাল দিয়ে যাবে, কিছু শ্রদ্ধা সম্মান ফিরিয়ে দেওয়াই তো উচিত। তবে মুস্কিল এই, যাকে নিচু ভাবি তাকে ঠিক ভালোবাসাও যায় না, শ্রদ্ধা ও সম্মানও করা যায় না। সেজন্য আগে নিজের মিথ্যা অহঙ্কারটা ছাঁটা দরকার।

নিজের কথা

নিজের গল্প বাছাই করা বড়ই ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। ঠিক যেন নিজের সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেছে নেবার চেষ্টা যে জীবন সমাজ সাহিত্য ইত্যাদি আসল পরীক্ষায় কে সবচেয়ে ভালোভাবে পাশ করেছে অর্থাৎ উৎরে গিয়েছে।

অনেক বছর ধরে অনেক গুণ্ডা ছেলেমেয়েকে জন্ম দেওয়া হয়ে থাকলে বাছাই করায় ঝঞ্ঝাট বা মুস্কিলটা সত্যই বিষম হয়ে দাঁড়ায়।

কোন নিয়মে বাছাই করবো? থ্যাঁদা নাক থ্যাবড়া গাল কালো রোগা নোংরা মেয়েটাই হয় তো বাপের সব চেয়ে আদুরে—জগৎ-সংসারে উলঙ্গ সত্যের নির্ভিক নিরাবরণ নিছক খাঁটি মহান প্রতীক হিসাবে হয় তো আর কোন তুলনা খুঁজে পাওয়াই সম্ভব নয় বাপের স্নেহান্ধ দৃষ্টি এবং বিচারে।

এটাই কি শেষ কথা?

মায়া?

কী হাস্যকর ভাবেই মায়াকে অস্বীকার করেন মায়াবাদী পণ্ডিতেরা! জীবনকে জানা আর জীবনকে মায়া করা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। একটাকে বড় করে অন্যটাকে তুচ্ছ করা জীবনদর্শীর পক্ষে বীভৎস অপরাধ।

লেখকের কথা

অবাস্তব কথা টেনে আনলাম কি—বেদবেদান্ত উপনিষদের মূলতত্ত্ব ?

তা নয়। বড় ব্যাপার সম্পর্কে হলেও কথাটা অতিশয় সহজ এবং সরল। জগৎ আর মানুষকে জানা আর ভালোবাসা যে একত্রীকৃত প্রক্রিয়া। একটা ছাড়া অন্যটা যে শুধু অসম্ভব নয়, অর্থহীনও বটে—এটুকু বোঝা আজকেব দিনের মানুষের পক্ষে মোটেই কঠিন হওয়া উচিত নয়।

গল্প নির্বাচনে কোন্‌টা আগে লেখা কোন্‌টা পরে লেখা সে হিসাব কষিনি। গল্পের বিচারে ধারাবাহিকতার হিসাবটাই নিরর্থক।

দশজনে আমার যে গল্পকে যতটা সমাদর করেছেন মোটামুটি সেটাই আমি এই সঙ্কলনের জন্য গল্প নির্বাচনের মাপকাঠি ধরে নিয়েছি।

আমার বিচার হয় তো সকলের মনঃপূত হবে না। এ গল্পটা কেন নির্বাচন করলাম এবং ও গল্পটা কেন বাদ দিলাম তাই নিয়ে নানারকম প্রশ্ন উঠবে।

সেটাও আমি কামনা করি—প্রশ্ন উঠুক, সমালোচনা হোক, দশজনে আমার বিচার বিবেচনার ভুলত্রুটি সংশোধন করে দিন। সাহিত্যিকের পক্ষে সেটা পরম সৌভাগ্যের কথা।

উপন্যাসের ধারা

লিখতে শুরু করার আগে শুধু আশা নয়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও ছিল যে, একদিন আমি লেখক হবো। তবু নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় সাগ্রহে ছাত্র হয়েছিলাম বিজ্ঞানের, অনার্স নিয়েছিলাম অঙ্কশাস্ত্রে। আজ চর্চা নেই সময় আর সুযোগের অভাবে ; কিন্তু বিজ্ঞানকে আজও সমানভাবেই ভালোবাসি।

লিখতে শুরু করেই আমার উপন্যাস লেখার দিকে ঝোঁক পড়লো। কয়েকটি গল্প লেখার পরেই গ্রাম্য এক ডাক্তারকে নিয়ে আরেকটি গল্প ফাঁদতে বসে কল্পনায় ভিড় করে এল 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র উপকরণ এবং কয়েকদিনে একটি গল্প লিখে ফেলার বদলে দীর্ঘদিন ধরে লিখলাম এই দীর্ঘ উপন্যাসটি—এ ব্যাপারের সঙ্গে সাধ করে বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার সম্পর্ক অনেকদিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। মোটামুটি একটা ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলাম যে, সাহিত্যিকেরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে বর্তমান যুগে, কারণ তাতে অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের অনেক চোরা মোহের স্বরূপ চিনে সেগুলি কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়।

পরে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাকে ভালো করে তলিয়ে

বুঝে 'কেন লিখি?' তত্ত্বগত দিকটার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার প্রয়োজন জরুরী হয়ে উঠলো সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে নানা এলোমেলো থিয়োরি ও তার ব্যাখ্যার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। তখন অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে একটা আশ্চর্য কথাও স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, লিখতে আরম্ভ করার আগেও বলে দেওয়া সম্ভব ছিল —যদি কোনদিন আমি লিখি ঝোঁকটা আমার পড়বে উপন্যাস লেখার দিকে।

আমার বিজ্ঞান-প্রীতি, জাত বৈজ্ঞানিকের কেন-ধর্মী জীবন-জিজ্ঞাসা, ছাত্রবয়সেই লেখকের দায়িত্বকে অবিশ্বাস্য গুরুত্ব দিয়ে ছিনিমিনি লেখা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি কতগুলি লক্ষণে ছিল সুস্পষ্ট নির্দেশ যে, সাধ করলে কবি হয় তো আমি হতেও পারি; কিন্তু ঔপন্যাসিক হওয়াটাই আমার পক্ষে হবে উচিত ও স্বাভাবিক!

কথাটা কী দাঁড় করাচ্ছি? আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞানের ছাত্র না হলে, কিঞ্চিৎ বিজ্ঞান চর্চা না করলে, উপন্যাস লেখা যায় না? আজ পর্যন্ত যাঁরা উপন্যাস লিখেছেন তাঁরা সকলেই—?

যেহেতু বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও আমি দু'চারখানা উপন্যাস লিখেছি সেই হেতু ওটাই হবে উপন্যাস লেখার একটা সর্ত—যেটুকু বলেছি তার এরকম যান্ত্রিক ও হাস্যকর তাৎপর্য কারো কারো মনে আসা আশ্চর্য নয়। কথাটা এখানেই পরিষ্কার করা দরকার। সরাসরি বিজ্ঞানের

কিছু শিক্ষা পাওয়া নয়, উপন্যাস লেখার জন্য দরকার খানিকটা বৈজ্ঞানিক বিচারবোধ। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কিছুমাত্র পরিচয় না থাকলেও এ বিচারবোধ মানুষের আয়ত্ত হতে পারে। সমাজ ও জীবনে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রভাব ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এই প্রভাবের জন্য সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের চিন্তাজগতে, তার দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈজ্ঞানিকের চিন্তাপদ্ধতির, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ পড়েছে,—যত কম আর অস্পষ্টই সেটা হোক। বিজ্ঞানচর্চা না করেও এবং সম্পূর্ণরূপে নিজের অজ্ঞাতসারে হলেও, ঔপন্যাসিক খানিকটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান-প্রভাবিত মন উপন্যাস লেখার জন্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন যুগের যে কোন উপন্যাস ধরে বিশ্লেষণ করলে লেখকের এই বৈশিষ্ট্য, বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে এই বিশেষ ধরনের মানসিক সমতা খুঁজে পাওয়া যাবে।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কহীন নয়। সমাজের মাধ্যমে সে সম্পর্কের সূত্রগুলি পাওয়া যায়। সাহিত্যের তথাকথিত সবচেয়ে অবৈজ্ঞানিক অঙ্গ কবিতার গতিপ্রকৃতি বিজ্ঞানের সমকালীন বিকাশের সাথে কি ভাবে জড়িত তা খুঁজে বার করা কষ্টসাধ্য কাজ, কিন্তু উপন্যাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক অনেক বেশি স্পষ্ট ও ঘনিষ্ঠ। সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপন্যাস হলো সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ অবদান।

লেখকের কথা

বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের একটা স্তর পর্যন্ত সাহিত্য ছিল, উপন্যাস ছিল না। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি সমাজ জীবন ও মানুষের চেতনায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটানোর ফলেই সাহিত্যে উপন্যাসের আঙ্গিক প্রয়োজনীয় এবং আদরণীয় হয়।

কাব্য ও নাটকের আঙ্গিকে ভাববাদ অবাধে আত্মপ্রকাশ করেছে। কার্য ও কারণকে রাখা গিয়েছে ভাববাদেরই স্তরে, মানে খোঁজা সম্ভব হয়েছে জীবন ও জগতের। অধ্যাত্মবাদকে টেনে আনা গিয়েছে যতখানি প্রয়োজন। কিন্তু বিজ্ঞান তো ছেড়ে কথা কয় না। বিজ্ঞানকে যে যুগে যাই ভেবে থাকুক মানুষ, বিজ্ঞানের ভিত্তি চিরদিনই স্বীকৃত বা অস্বীকৃত বস্তুবাদ। যে বিশ্বাস নিয়েই বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও গবেষণা করে থাকুন, বস্তুজগতে মানবতার বাস্তব অগ্রগতিই চিরদিন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

নিত্য নতুন আবিষ্কারে বিজ্ঞান বদলে দিয়ে চলে সমাজ ও জীবনকে, বদলে দিয়ে চলে মানুষের চেতনাকে। এই চেতনায় জাগে সাহিত্যের কাছে নতুন চাহিদা এবং এই চেতনা প্রতিফলিত হয় নতুন আঙ্গিকে উপন্যাস রচনায়।

গদ্য ভাষায় সাহিত্যে এল বাস্তব জীবনের পরিবেশ, চরিত্র ও ঘটনা ; নতুন পদ্ধতিতে মানুষের জীবন বোধের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে আরম্ভ করলো উপন্যাস।

বিজ্ঞানকে, মানুষের বস্তুবাদী চেতনার ক্রমবিকাশকে, একেবারে আর উপেক্ষা করতে না পেরে সাহিত্যকে নতুন

একটি বিভাগ খুলতে হলো : অধ্যাত্মবাদের জের এবং ভাববাদ আত্মরক্ষার খাতিরে যুক্তিবাদের সাহায্যে বাস্তবতাকে কাজে লাগিয়ে শুরু করলো উপন্যাসের ধারা।

যুক্তিবাদ খাঁটি দর্শনে বিশেষ খাতির পায়নি—ইতিহাস দর্শনকে যে মূল ভাগে ভাগ করেছে (অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদ ও বস্তুবাদ) তারই নানারকম আল্‌তো বাদ হিসাবে অনেক শাখাপ্রশাখা গজিয়েছে, যুক্তিবাদ তারই একটা।

যুক্তিবাদ কারণ দেখায় না, যুক্তি দেয়। 'এরকম হওয়া উচিত' এটাও যুক্তিবাদের যুক্তি।

দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের অবদান খুবই সামান্য, সাহিত্যে উপন্যাসের নব-বিধান যেন যুক্তিবাদেরই জয়গান—আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়। আসলে সেটা বস্তুবাদেরই অগ্রগতি। অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদ এবং বস্তুবাদ কোনটাই সমসাময়িক সুবিধাবাদের নীতি মানেনি। মানবতার বিকাশের মূলনীতি ক্ষয়বৃদ্ধি এগোনো পিছানোর বাস্তব কার্যকরী নীতিকেই মেনে এসেছে।

বাদ নিয়ে বাদানুবাদের প্রবন্ধ লিখতে চাইনি। এটুকু ভূমিকা মাত্র। আমার অভিজ্ঞতায় এটুকু যাচাই হয়ে গিয়েছে গোড়াতেই। খুব সহজ করে বলতে গেলে বলা যায় যে, লেখক যে ভাব আর ভাবনাই সাজিয়ে দিন উপন্যাসে, ভিত্‌টা তাঁকে গাঁথতেই হবে খাঁটি বাস্তবতার। যতই খাপছাড়া উদ্ভট হোক উপন্যাসেরই চরিত্র, মাটির পৃথিবীর মানুষ হয়ে তাকে খাপছাড়া উদ্ভট হতে হবে।

যত অসম্ভব ঘটনাই ঘটুক উপন্যাসে, সম্ভাব্য ঘটনাকে আশ্রয় করেই তাকে কাল্পনিক অসম্ভবতার স্তরে উঠতে হবে। উপন্যাসেও কাব্য সৃষ্টি করা যায়, কল্পনা পার হয়ে যেতে পারে বাস্তবতার সীমা, গড়ে উঠতে পারে এমন এক মানস জগৎ যার অস্তিত্ব লেখকের মন ছাড়া কোথাও নেই ; কিন্তু বাস্তব মানুষ বাস্তব জীবন বাস্তব পরিবেশ অবলম্বন করেই এসব ঘটাতে হবে।

কবি-বন্ধুর মনে কথা জাগতো, কথায় তিনি তা প্রকাশ করে দেখতেন! কবিতা লিখতেন কিম্বা লিখতেন ছোটগল্পরূপী গদ্য-কবিতা। আমার মনেও কথা জাগতো, কথা তুলে রাখতাম মনেরই তাকে। বাস্তবতার আশ্রয় ছাড়া আমার কথা দাঁড়াবে কিসে? আরও বয়স বাড়ুক, অভিজ্ঞতা হোক, বাস্তবতাকে আরও ভালো করে জেনে চিনে আমার কথার ভিত্ গাঁথতে শিখি, তারপর মনের কথাকে বাইরে আনবো। একদিন উপন্যাস লিখবো ভাবতাম কি? মোটেই না। সোজাসুজি ভাবতাম যে, লিখতে শুরু করার আগে আমাকে আরও পাকতে হবে? উপন্যাস লিখতেই যে এই পাকামি দরকার হয় সেটা জেনেছি অনেক পরে।

প্রথম লিখলাম একটি গল্প—তাও লেখার খাতিরে নয়, কয়েকটি ছাত্রবন্ধুর সঙ্গে তর্কের ফলে সাধারণ একটা বাস্তব সত্যকে হাতে নাতে প্রমাণ করার জন্য। এ ঘটনার মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছিল আমার ঔপন্যাসিকের ধাত,—সাধারণ যুক্তিবোধ, বাস্তব-বোধ। তর্কটা ছিল মাসিকের সম্পাদক-

মশাইদের অবিবেচনা, উদাসীনতা, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি দোষ নিয়ে। সম্পাদকেরা কিরকম জীব কিছুই জানতাম না, কিন্তু ভালো একটা লেখা হাতে পেলেও শুধু লেখকের নাম নেই বলেই লেখাটা তাঁরা বাতিল করে দিয়ে থাকেন, এটা কোনমতেই মানতে পারিনি। কোন যুক্তিই খুঁজে পাইনি সম্পাদকদের এই অর্থহীন অদ্ভুত আচরণের। ভালো লেখার কদর নেই কদর আছে শুধু নাম-করা লেখকের এ তো স্রেফ পরস্পরবিরোধী কথা। যদি ধরা যায় যে, ভালো গল্প লেখা অতি সহজ, গাদাগাদা ভালো গল্প তৈরি হওয়ায় সম্পাদকের কাছে তার বিশেষ কোন চাহিদা নেই—তা হলে নাম-করা লেখকের নামেরও কোন মানেই থাকে না। এত সোজা কাজ করার জন্য নাম হয় কিসে ?

ভালো লেখা অন্যান্য কারণে সম্পাদকীয় অবজ্ঞা লাভ করতে পারে, লেখক নতুন বলে কখনোই নয়! এই সত্যটা প্রমাণ করার জন্য নিজে একটি গল্প লিখেছিলাম।

সাহিত্যজগতের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ না থাকলেও উপলব্ধি করেছিলাম যে, সাহিত্যের জগৎও মানুষেরই জগৎ, সংসারে সাধারণ নিয়মকানুন সাহিত্যের জগতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে না। মোটামুটি ভালো এক গল্প লিখলে যে কোন সম্পাদক যে সেটা নিশ্চয় সাগ্রহে ছাপবেন এ বিষয়ে এমনই দৃঢ় ছিল আমার বিশ্বাস যে তখনকার সেরা তিনটি মাসিকের যে কোন একটিতে ছ'মাসের মধ্যে আমার গল্প বার করা নিয়ে বাজী রাখতে

দ্বিধা জাগেনি। কবি মনের ঝোঁক নয়, ঔপন্যাসিকের প্রতীতি—যা আসে বাস্তব হিসাব নিকাশ থেকে।

গল্পটা লেখার মধ্যে ছিল এই বাস্তব বিচারবিবেচনা, কি হয় আর কি না হয় তার হিসাব। এর মধ্যেও সন্ধান পাওয়া যাবে যে, ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিক একদিকে কিরকম নির্বিকার নিরপেক্ষভাবে বাস্তবতার সমগ্রতাকে ধরবার চেষ্টা করেন, অন্যদিকে তারই মধ্যে বজায় রেখে চলেন আবেগ অনুভূতির সততা—মোহহীন মমতাহীন বিশ্লেষণে সত্যকে যাচাই করে নিয়ে তার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করেন (যার যেমন বিশ্লেষণ ও যার যেমন প্রাণ!)। প্রথমে হিসাব করেছিলাম কি ধরনের গল্প লিখবো। সবদিক দিয়ে নতুন ধরনের নিশ্চয় নয়! একেবারে আনাড়ি, হঠাৎ একদিন কলম ধরে নতুন টেকনিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন বিষয়ের গল্প খাড়া করা সম্ভবও নয়, বেশি 'নতুনত্ব' সম্পাদকের পছন্দ নাও হতে পারে। ভেবেচিন্তে স্থির করেছিলাম যে, রোমান্টিক গল্প লেখাই সবচেয়ে সহজ, এরকম গল্প জমে গেলে সম্পাদকেরও চট করে পছন্দ হয়ে যাবে।

আদর্শ অপার্থিব প্রেমের জমকালো গল্প ফাঁদতে হবে। কিন্তু সমস্তটাই আজগুবি কল্পনা হলে তো গল্প জমবে না, বাস্তবের ভিত্তিও থাকা চাই গল্পের। কি হবে এই ভিত্তি? কাহিনী যদি দাঁড় করাই প্রেমাত্মক অবাস্তব কল্পনার, গল্পের চরিত্রগুলিকে করতে হবে বাস্তব রক্ত-মাংসের মানুষ।

অতিজানা অতিচেনা মানুষকে তাই করেছিলাম

'অতসী মামী'র নায়ক নায়িকা। সত্যই চমৎকার বাঁশি বাজাতেন চেনা মানুষটি, বেশি বাজালে মাঝে মাঝে সত্যই তাঁর গলা দিয়ে রক্ত পড়তো এবং সত্যই তিনি ছিলেন আত্মভোলা খেয়ালী প্রকৃতির মানুষ। ভদ্রলোকের বাঁশি বাজানো সত্যই অপছন্দ করতেন তাঁর স্ত্রী, মাঝে মাঝে কেঁদে কেটে অনর্থ করতেন।

শুধু এটুকু নয়। সত্যই দু'জনে তাঁরা একেবারে মশগুল ছিলেন পরস্পরকে নিয়ে। এঁদের দেখেছিলাম খুবই অল্প বয়সে, সেই বয়সেও শুধু এঁদের কথা বলা, চোখে চোখে চাওয়া দেখে টের পেতাম অন্যান্য অনেক জোড়া চেনা স্বামী-স্ত্রীর চেয়ে এঁদের মধ্যে বাঁধনটা ঢের বেশি জোরালো, সাধারণ রোগে ভুগে ভদ্রলোক মারা গেলে কিছুকালের জন্য তাঁর স্ত্রী পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

অতসী মামী লিখবার সময় এঁদের দু'জনকে আগাগোড়া মানস চোখের সামনে রেখেছিলাম। শুধু তাই নয়। সোজাসুজি কাহিনীটা লিখে না গিয়ে নিজে আমি অল্পবয়সী একটি ছেলে হয়ে গল্পের মধ্যে ঢুকে তার মুখ দিয়ে গল্পটা বলেছিলাম।

আমার এই প্রথম গল্পের কাহিনী হাস্যকর রকমের রোমান্টিক কল্পনা। আজও যখন ট্রেন দুর্ঘটনার রাত্রে প্রতিবছর অতসী মামীর রেললাইনের ধারে নির্জন মাঠে একাকিনী সারা রাত মৃত প্রিয়ের সঙ্গ অনুভব করতে যাওয়ার কথা ভাবি, আমার নিজেরই হাসি পায়। এমনি

ভাবতে গেলে হাসি পায়, কিন্তু আজও গল্পটি প্রথম থেকে পড়ে গেলে আর মনে মনেও হাসবার সাধ্য হয় না।

কারণ, কাহিনী রূপকথা হলেও নায়ক-নায়িকা জীবন্ত মানুষ, উদ্ভটভাবে হলেও কাহিনীতে প্রতিফলিত হয়েছে মাটির পৃথিবীর দুটি মানুষের বাস্তব প্রেম।

আমার এই আদি গল্পের মোট কথা আর সাহিত্যের আদিম উপন্যাসের মোট কথা একই—কল্পনার রূপায়নের জন্য বাস্তবকে আশ্রয় করা। উপন্যাসে বাস্তবের ক্ষেত্র হয় আরও ব্যাপক ও প্রসারিত—অনেক রকমের অনেক মানুষকে তাদের বাস্তব জীবন ও পরিবেশ সমেত টেনে এনে কাহিনী ফাঁদতে হয়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই কবিতার চেয়ে উপন্যাসে ভাববাদী কল্পনার স্থান বস্তুবাদী কল্পনা অনেক সহজে ও দৃঢ়ভাবে দখল করছে।

নতুন জীবন

'নতুন জীবন' যৌনতত্ত্ব ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত মাসিক পত্রিকা। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এত এত সাহিত্য পত্রিকা থাকতে যৌনতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যবিষয়ক পত্রিকার প্রসঙ্গ কি জন্য?

একটি কারণ এই যে, নতুন জীবনের পৃষ্ঠাগুলি প্রধানতঃ যা দিয়েই ভরা থাক, এটিও সাহিত্য পত্রিকাই। আমার বিবেচনায়, কেবল গল্প কবিতা উপন্যাস বোঝাই অনেক তথাকথিত সাহিত্য পত্রিকার চেয়ে উচ্চাঙ্গেরও বটে। গল্প উপন্যাসও নতুন জীবনে কিছু কিছু স্থান পেয়ে আসছে, যদিও সেগুলি একটু বিশেষ ধরনের, উদ্দেশ্যমূলক।

আর একটি কারণ, নতুন জীবনই একমাত্র পত্রিকা যা বাংলা ভাষায় এই ধরনের সাময়িকপত্রের অভাব মেটাবার আদর্শ সামনে রেখে সক্রিয় প্রচেষ্টা করে আসছে বলা যেতে পারে। যৌন ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রথম শ্রেণীর একটি জনপ্রিয় সাময়িক পত্রের অভাব নতুন জীবন মেটাতে পেরেছে বলতে পারি না, কিন্তু ভালো জিনিষ পরিবেশন করে সত্যসত্যই পাঠকের উপকার করার আন্তরিক প্রেরণা এই পর্যায়ের মাসিকগুলির মধ্যে নতুন জীবনেই খুঁজে পেয়েছি। অন্য যে পত্রিকা আমি দেখেছি তাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির

এবং যৌন ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় জ্ঞান পরিবেশনের ভানটাই শুধু আছে—বিকারগ্রস্ত মানুষের মনে নিষিদ্ধ অশ্লীল বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করার যে চুলকানি আছে সেটা উস্কে পত্রিকা চালনাই অনেকের আসল উদ্দেশ্য। এমন কি বিজ্ঞানপন্থী পত্রিকা বলে ঘোষিত হলেও যৌনব্যাধি ও স্বাস্থ্যহানির হাতুড়ে ওষুধ আর মাদুলি তাবিজের লোকঠকানো স্পষ্ট জুয়াচুরির বিজ্ঞাপনও এই সমস্ত পত্রিকায় অনায়াসে স্থান পায়।

এবিষয়ে নতুন জীবনের সম্পাদকের নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। ফাঁকিবাজি বিজ্ঞাপন—পয়সা যাতে বেশি মেলে তাঁর কাগজে ছাপা হয় না। অতি সহজে আইন বাঁচিয়ে বিজ্ঞাপনের এই ঘৃণিত ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে নতুন জীবন জেহাদ ঘোষণা করেছে। সমস্যাটা সত্যই তুচ্ছ নয়। শুধু লক্ষ লক্ষ রুগ্ন হতাশ মানুষের জীবনটাই এই প্রবঞ্চকের দল ব্যর্থ করে দিচ্ছে না, সমাজের নৈতিক জীবনের ভিত্তিমূলেও এরা আঘাত হানছে। এ দুর্ভাগা দেশের অন্য বড় বড় সমস্যাগুলির মতো এ সমস্যারও আসল মীমাংসা অবশ্য রাষ্ট্র ও সমাজের সেই পরম সংস্কারে। কিন্তু কাগজে কাগজে এদের বিরুদ্ধে লড়বার, মানুষকে এদের সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবার চেষ্টার প্রয়োজনও কম নয়। কুৎসিত বিজ্ঞাপনের আলোচনাও কুৎসিত হবে—এই আশঙ্কাতেই কি বড় বড় পত্রিকায় অন্য সব বিষয়ে আলোচনা থাকলেও এবিষয়ে কখনো আলোচনা হয় না? অথবা অন্য কারণ আছে?

যৌন বিষয়ে কতগুলি প্রাথমিক জ্ঞানের অভাব মানুষের পক্ষে যেমন ক্ষতিকর, অজ্ঞ সংস্কারবদ্ধ ভাবপ্রবণ মানুষকে সেই যৌনজ্ঞান দেবার প্রক্রিয়া ভুল হলে তাও কম বিপজ্জনক হয় না। এ বিষয়ে সম্পাদক ও পরিচালকদের দায়িত্ব গুরুতর। অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী হবার সম্ভাবনাই থাকে বেশি এবং নতুন জীবনেব মতো সাধারণের উপযোগী পত্রিকার পক্ষে পাঠক-পাঠিকাকে অল্পবিদ্যার বেশি কিছু দেওয়া চেষ্টা করেও সম্ভব নয়। তাই কঠোর নিষ্ঠা ও অখণ্ড সতর্কতার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি যাতে লব্ধ জ্ঞানটুকু পাঠক-পাঠিকার সত্যই কাজে লাগে, তাদের বিভ্রান্ত না করে দেয়।

নতুন জীবনের অনেকগুলি লেখায় একটি মূলনীতি অনুসরণ করা হয়েছে বোঝা যায়, যা থেকে এই অপরিহার্য সতর্কতা সম্পর্কে সম্পাদককে সচেতন মনে হয়। লেখকদের দায়িত্বজ্ঞানেরও পরিচয় মেলে। আমাদেরই প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনে কার্যকরী জানবার কথায় আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা লেখাগুলিতে করা হয়েছে। শিশুর যৌনবোধ নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য স্পষ্টতঃ এই যে, শিশুর যৌনবোধের অস্তিত্ব ও স্বরূপকে ছেলেমেয়ে মানুষ করার জন্য বড়দের যতখানি মানা ও জানা দরকার ততখানিই মানিয়ে ও জানিয়ে দেওয়া। এ লেখায় অনায়াসে জটিলতা এসে সংশয় ও ভ্রান্তির সৃষ্টি করা চলতো। স্বাভাবিক যৌনশক্তি লাভের কয়েকটি সহজ ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ উপায়

শিরোনামা দেখে আতঙ্ক হয়েছিল। সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি পড়ে খুশি হলাম, লেখককে মনে মনে ধন্যবাদও জানালাম। এত সহজ ও স্পষ্টভাবে কাজের কথা লেখা কঠিন, বিষয়টি নিয়ে ফেনিল আলোচনার প্রলোভন সত্যই প্রবল।

সব লেখায় এ নীতি বজায় থাকেনি। সহজ জানবার কথার সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে কঠিন তথ্যের। ফলে লেখাগুলি সামঞ্জস্য হারিয়েছে। কেবল সহজ বোধ্য কথা নিয়েই আলোচনা থাকবে, উঁচুস্তরের জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা থাকবে না, তা বলছি না। কিন্তু একই লেখার খানিকটা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করতে চেয়ে বাকিটা দুর্বোধ্য রেখে পাঠকের মনে বিপর্যয় সৃষ্টি করা অসঙ্গত মনে হয়। কঠিন বিষয়ে লেখায় একটি নিয়ম অবশ্য পালনীয়: যে শ্রেণীর পাঠকের জন্য লেখা রচনাটি যেন সেই এক শ্রেণীর পাঠকেরই উপযোগী হয়। একটি লেখাকে অজ্ঞ ও জ্ঞানী সকলেরই পাঠযোগ্য করতে চাওয়ার মানে হয় না। একই বিষয়ে দুটি লেখা প্রকাশ করাও বরং তার চেয়ে শ্রেয়। তা যদি সম্ভব না হয়, লেখার আগা গোড়া অধিকাংশ পাঠকের জ্ঞান বুদ্ধির অভিজ্ঞতার পক্ষে গ্রহণযোগ্য করা না যায়, তবে প্রবন্ধটি মুষ্টিমেয় সেই ক'জনের জন্যই লেখা হোক—গ্রহণ করার ক্ষমতা যাদের আছে। সাময়িক পত্রে এরকম দু'একটি লেখা থাকা দোষের কিছু নয়। সাধারণ পাঠকের গ্রহণযোগ্য আরও রচনা তো আছে। দুটি একটি দুর্বোধ্য লেখা সাধারণ পাঠকের উপকার ছাড়া

অপকার করে না। লেখাটি বুঝবার জন্য কারো কারো মনে ও-বিষয়ে পড়াশোনা করে নিজেকে তৈরি করে নেবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। কিন্তু কিছু বোঝা আর কিছু না-বোঝা তার পক্ষে প্রায়ই ক্ষতিকর। কিন্তু বোঝাটাই অর্থহীন। কোন জ্ঞাতব্য বিষয়েই খানিকটা টুকরা ভেঙে নিয়ে মানুষ আত্মসাৎ করতে পারে না। কিছু বোঝার মানে তার ভুল ধারণার সৃষ্টি হওয়া যে সে সব বুঝেছে। নিজের ধারণা ও কল্পনা দিয়ে সে তারপর সমগ্র ভ্রান্তি গড়ে তুলবে। 'সঙ্কর রক্ত কি সত্যই প্রতিভার সৃষ্টি করে?' লেখাটিতে সামঞ্জস্যের এই অভাব।

বরং 'সঙ্গীতে যৌনতা'র বিষয় বস্তু আরও বেশি সূক্ষ্ম ও গভীর হলেও লেখাটিতে অনেকটা সামঞ্জস্য আছে—যতখানি বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন পাঠককে সামনে ধরে লেখক লিখতে শুরু করেছেন শেষ পর্যন্ত মোটামুটি তাকেই সামনে খাড়া রেখেছেন। 'আধুনিক প্রেমের কবিতা'র সম্বন্ধে এ কথা বলতে পারলাম না। 'পুরুষ কি নারীতে তৃপ্ত?' প্রবন্ধটিতে বহু বিতর্কের উপাদান থাকলেও পাঠকের মনে নতুন ভ্রান্তি সৃষ্টির সহায়তা করে না।

নতুন জীবনের পথ নতুন। সাহিত্য ও সমাজপ্রীতির আদর্শ যত জোরালো হবে পথ ততই প্রশস্ত ও দীর্ঘ হবে।

প্রেস মালিকদের ষড়যন্ত্র

বাংলার সংস্কৃতিকে বেঁচে থাকতে হয়েছে রাষ্ট্রশক্তির চরম ঔদাসীন্য ও সক্রিয় প্রতিকূলতা এবং প্রতিক্রিয়াপন্থীদের গোপন ও প্রকাশ্য শত্রুতার সঙ্গে সংগ্রাম করে। আজ যখন সংস্কৃতির সংকট ও সংগ্রাম চরমে উঠেছে গৃহযুদ্ধের বীভৎস আবহাওয়ায়, শোষণে পেষণে স্বাধীনতা হরণে ও অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গ-ভঙ্গরূপী অপমৃত্যু দাবির সম্ভাবনায়, তখন পিছন থেকে অতর্কিত এক আক্রমণ এল। প্রেস মালিক সমিতির পক্ষ থেকে ছাপার চার্জ বাড়াতে বাড়াতে ১৯৪৬ সালে যেখানে ঠেকেছিল (যুদ্ধের আগেকার হারের তা তিনগুণ হলেও) সম্প্রতি হঠাৎ প্রেস মালিক সমিতি তা ডবল করে দিয়েছেন। হাজার বিরোধী শক্তিও বাংলায় যে সাংস্কৃতিক ঐক্যে ভাঙন ধরাতে পারেনি, অগ্রগতি ঠেকাতে পারেনি, এমন সহজ সরল মোক্ষম উপায়ে তার বিনাশসাধনের ব্যবস্থা করতে আমলাতন্ত্রও কখনো সাহস পায়নি—তাহলে আর কোথায় কোন ছাপা বইয়ে রাজদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ আছে তা সতর্কভাবে খুঁজে খুঁজে বেছে বেছে বইকে নিষিদ্ধ বাজেয়াপ্ত করার কোন দরকার হতো না।

হঠাৎ বই ছাপাবার খরচ অবাস্তব অসম্ভব রকম বাড়িয়ে

দিয়ে একটি অস্ত্রে বাঙালী লেখক প্রকাশক সাধারণ পাঠককে ও ছাত্রছাত্রীকে কাবু করে প্রেস মালিক সমিতি বাঁচার যুদ্ধে বাঙালীর বৈপ্লবিক চেতনার অদ্ভুত জাগরণে ভীতগ্রস্ত শত্রুদের খুশি ও নিশ্চিন্ত করে দিয়েছেন। লিখে কোনদিন বাঙালী লেখকের পেট ভরেনি, বইয়ের লাভের যে সামান্য অংশ লেখকের জুটতো, এবার তা প্রেস মালিকদের গ্রাসে যাবে। তবু যদি সাহিত্য-ব্রতী না লেখা ছাড়েন —জীবিকার জন্যই তাঁকে অপচয় করতে হবে বেশির ভাগ শক্তি ও সময়। অখ্যাত উদীয়মান ও অল্পখ্যাত লেখকদের পাণ্ডুলিপি পচবে, প্রকাশকের সাহস হবে না তাদের বই ছাপিয়ে প্রকাশ করতে, বই মার খেলেও অন্তত মোটামুটি খরচ উঠে আসার নিশ্চয়তা শেষ হয়েছে। উৎসাহী প্রকাশক নিত্য নূতন বই প্রকাশের প্রচেষ্টা গুটিয়ে আনবেন, সাহিত্যিক মূল্য আছে এমন বইয়ের বদলে নজর দেবেন সস্তা চটকদার বই প্রকাশের দিকে, বেশি দাম দিয়ে টাকাওলা খদ্দেররা যে বই কিনবে উপহারের জন্য, যৌন বা ডিটেকটিভ থ্রিলের নেশা মেটাতে। যুদ্ধের বাজারে কাগজের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতা, ছাপা বাঁধাইয়ের দর বৃদ্ধি, সরকারী কনট্রাক্টের মুনাফার দম্ভে বাংলা বই ছাপানো সম্পর্কে প্রেস মালিকদের নির্লজ্জ অবজ্ঞা এবং আরো নানা অসুবিধা সত্ত্বেও পুস্তক প্রকাশের ব্যবসায়ে নবজীবনের সূচনা দেখা দেয়। বাঙালী বই কেনে না এ অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত

করেছিল শিক্ষিত বাঙালী উপার্জনের সুযোগ পেয়েই। ১৯৪৬ সালে প্রেস মালিক সমিতি যুদ্ধপূর্ব হারের তুলনায় ছাপার চার্জ তিনগুণ করায় বইয়ের দাম বেড়ে যাওয়াতেও বইয়ের বাজারে মন্দা আসেনি। বরং কাগজ একটু বেশি পাওয়া যেতে থাকায় প্রকাশিত পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। যুদ্ধোত্তর ব্যাপক ছাঁটাই ও অর্থনৈতিক অবনতিও শিক্ষিত বাঙালীর বই কিনে পড়ার নবজাগ্রত ক্ষুধার চাহিদাকে দমাতে পারেনি। দাঙ্গাহাঙ্গামার কলঙ্কিত অধ্যায় শুরু না হলে বই বিক্রির সংখ্যা থেকেই প্রমাণ হয়ে যেতো সন্দেহ নেই যে, গরীব বাঙালীর মনের খোরাক সংগ্রহেরও অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা বোধ কমার বদলে দিন দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু খাদ্যের দাম বাড়তে বাড়তে একটি সীমা ছাড়িয়ে গেলে সাধারণ লোক দুর্ভিক্ষে না খেয়ে মরে। মালিকদের রেটে ছাপাতে হলে বইয়ের দামও সেই সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে সাধারণ মানুষকে মানসিক দুর্ভিক্ষ বরণ করতে বাধ্য করবে। অনেক ছাত্রকে পাঠ্য পুস্তকের অত্যধিক দামের জন্য পড়া ছাড়তে হবে, স্কুল কলেজের শিক্ষার খরচের চাপে যে অসংখ্য ছাত্রও তাদের পরিবারকে অনেক কিছু 'ত্যাগ' স্বীকার করতে হয়, আরও খানিকটা ত্যাগের প্রয়োজন দেখা দেবে তাদের দুর্বহ জীবনে।

প্রেস মালিক সমিতি ছাপার হার এভাবে বাড়াবার

কোন কারণ দেখাননি। দেখাবার মতো কোন কারণ নেই। প্রেস কর্মীদের বেতন বাড়েনি, সরঞ্জামের দাম বাড়েনি, সরকারী কোন নতুন ট্যাক্স ঘাড়ে চাপেনি,—এমনও নয় যে, বাংলার প্রতি প্রীতি বশতঃ প্রেস মালিকরা এতকাল লোকসান দিয়ে বাংলা বই ছেপে আসছিলেন। বাংলা বই ছাপাবার জন্য মুনাফার হার কমেনি, বরং বইয়ের সংখ্যা বাড়ায় কাজের চাপের অজুহাতে একান্ত অবহেলার সঙ্গে যেমন তেমন করে খুশিমতো ছাপিয়ে দেবার স্বাধীনতা জুটেছে। যুদ্ধকালীন কনট্র্যাক্টের মোটা মুনাফা কমেছে কিন্তু বাংলা বইয়ের ঘাড় ভেঙে কি যুদ্ধোত্তর কালেও মুনাফার সেই স্ফীতি বজায় রাখার চেষ্টা চলবে? স্টেট্সম্যানে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর প্রতিবাদ পত্রের জবাবে প্রেস মালিক যে সংক্ষিপ্ত ও অর্থহীন কৈফিয়ত দিয়েছেন তাতে ১৯৪৬ সালের মোট হার ১৯৪৭ সালে ডবল করা হলো কেন তার কোন উল্লেখযোগ্য যুক্তি নেই, বরং আত্মসমর্থনে একটি মজার কথা আছে। প্রকাশকেরা বই বিক্রি করে অন্যায়রকম লাভ করেন, যে লাভ একটু কমালেই নাকি বইয়ের দাম বেশি না বাড়ালেও চলবে, লেখক বা সাধারণের ক্ষতি হবে না। কোন কোন প্রকাশক বই থেকে অন্যায় লাভ করেন সত্য, কিন্তু সেটা করেন লেখকের ন্যায্য পাওনা ফাঁকি দিয়ে। একটি সংস্করণের সমস্ত বই বিক্রি হবে ধরে নিয়েও (যে সৌভাগ্য খুব অল্পসংখ্যক বইয়ের ঘটে)

যদি হিসাব করা যায়, দেখা যাবে প্রকাশককে সামান্য লাভ রাখতে হলেও বইয়ের দাম অসম্ভব বেশি করতে হয়, যে দামে বই যে শুধু বিক্রি হবে না তা নয়, বিক্রি করতে যাওয়াও প্রকাশ্যভাবে পাঠকের পকেট মারতে চাওয়ার সামিল। বাঙালীর সাহিত্যপ্রীতির কুৎসিত অপব্যবহার।

বিশ্বভারতী সর্বাগ্রে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ ঘোষণা করে বাঙালীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। প্রেস মালিক সমিতির লাভের অঙ্ক বাড়াতে বাঙালীর রবীন্দ্র-ভক্তির ওপর ট্যাক্স বসাতে তাঁরা অস্বীকার করেছেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের পুনর্মুদ্রণ বন্ধ রইলো!

বাংলা দেশ প্রেস মালিক সমিতির এই স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেবে না, মানুষের তৈরি বইয়ের দুর্ভিক্ষে সাংস্কৃতিক অপমৃত্যু মেনে নেবে না।

সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ

সম্পাদক বার বার তাগাদা দিয়েছেন, আমি বার বার সময় চেয়ে নিয়েছি। কারণ, একজন সৎ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির "অনাগতের প্রতীক্ষায়"-এর (নতুন সাহিত্য, চৈত্র ১৩৫৯) মতো প্রবন্ধকে হঠাৎ গ্রহণ বা বর্জন করার মতো বিদ্যাবুদ্ধি আমার আছে কিনা জানা ছিল না।

"নতুন সাহিত্য" সম্পাদকের অনুরোধটাও মারাত্মক—তিনি সরাসরি আমাকে কথাশিল্পীর অবশ্য পালনীয় একটি মূলনীতি লঙ্ঘন করার আহ্বান জানিয়েছেন। অচ্যুতবাবুর সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি সম্পর্কে কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার দাবি তিনি জানাননি—ঐ প্রবন্ধে আমার সাহিত্য সম্পর্কে যে সমালোচনা আছে শুধু সে বিষয়ে আমার মতামত চেয়েছেন। অচ্যুতবাবুর বক্তব্য আমি কি ভাবে নিয়েছি এটুকু বলাই যথেষ্ট।

বন্ধুবর গোপাল হালদার তাঁর জবাবের শুরুতেই এ প্রথা চালু করে সম্পাদকের বিপদে পড়া সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

সম্পাদকের বিপদ! অভিমানে খোঁচা লাগায় লেখকরা চটে যাবেন, এটাই কি আসল কথা? নিজের সাহিত্যের শিল্পমূল্যের বিচারটা মনঃপূত না হলেই চটে

যাবেন এরকম শিশুর মতো অভিমানী লেখককে শুধু ধমক দিয়ে চটানো কেন, মেরে ধরে কাঁদালেই বা কি আসে যায়? দুটো মিষ্টি কথার লজেন্স দিলেই তো আবার তার মুখে হাসি ফুটবে!

নিজের লেখার সমালোচনা নিয়ে বাদপ্রতিবাদে নামার প্রথা চালু করার বিপদ বরং লেখকদেরই,—নীতিভঙ্গের বিপদ।

নিজের বই সম্পর্কে কোন সমালোচনার জবাবে লেখকের কিছু বলা সাংঘাতিক অনিয়ম।

নিন্দা বা প্রশংসা, অন্যায় আক্রমণ বা পিঠচাপড়ানো —এ সম্পর্কে তো বটেই, বই-এর কাহিনী, আঙ্গিক, শিল্পমূল্য ইত্যাদির বিচার-বিশ্লেষণ, সমালোচনা সঠিক বা বেঠিক হয়েছে সে বিষয়েও লেখক মুখ বুজে থাকতে বাধ্য। একটি গল্প বা উপন্যাস লিখে বাজারে ছাড়ার পর কে কোথায় কেন কিভাবে কি বলছে না বলছে লেখক নীরবে শুনে যাবেন। নির্ভেজাল সদিচ্ছা ও সৎসাহস নিয়ে নিজে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে, সমালোচনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকে স্বীকৃতি দিয়ে বা প্রতিবাদ জানিয়ে লেখক কিছু বলতে গেলেই সেটা দাঁড়াবে লেখকের নিজের ব্যক্তিত্ব খাটিয়ে ও প্রচার চালিয়ে পাঠক ও সমালোচক মহল বইখানা কিভাবে নেবেন তাদের সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা।

কিভাবে লিখবেন সে স্বাধীনতা লেখকের। সে লেখা

বিচার করার স্বাধীনতা সকলের। এইজন্য অসৎ সমালোচকের উদ্দেশ্যমূলক সস্তা গালাগালিও লেখক নীরবে উপেক্ষা করবেন। অসৎ সমালোচককে শায়েস্তা করার দায় অবশ্য অন্যান্য সৎ সমালোচকের এবং সাহিত্য-রসিকের।

নিজের বই সম্পর্কে নীরব থাকার নীতি কিন্তু লেখকের সমালোচক হবার স্বাধীনতা হরণ করে না। সাধারণভাবে সাহিত্যের এবং অন্যের বই-এর সমালোচনা করার অধিকার তাঁর সকলের মতোই বজায় থাকে। নিজের বই সম্পর্কে সমালোচকের বিচার-বিশ্লেষণ এবং মতামত সম্পর্কে চুপ করে থাকা নিয়ম হলেও সমালোচকের স্থূল অবাস্তব ভুল বা বিকৃতিগুলি লেখক দেখিয়ে দিতে পারেন। বই-এ যা আছে সমালোচনায় তা বিকৃত করলে অথবা যা নেই তা টেনে আনলে লেখকের প্রতিবাদ জানানো দোষের নয়।

যেমন, 'ইতিকথার পরের কথা'র "জমিদার-নন্দন" বিলাত ফেরত উচ্চশিক্ষিত নায়কের নামে অচ্যুতবাবু অপবাদ দিয়েছেন যে, "আজকে, একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে" তার মাথায় "গ্রামাঞ্চলে শিল্পবিস্তার করে জনসাধারণের জীবন উন্নয়ন" করার "বালখিল্য" কল্পনা এসেছে—সে আদর্শ "প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের পর স্বাভাবিক ছিল।"

এটা অচ্যুতবাবুর সম্পূর্ণ মনগড়া অপবাদ। বইটির

কোথাও নেই যে, "জমিদার নন্দনটি"র মাথায় গ্রামাঞ্চলে শিল্পবিস্তারের কল্পনা গজিয়েছিল অথবা কাজে সে এরকম কোন চেষ্টা করেছিল।

ভালোভাবে দেখাতে পেরেছি কি পারিনি সে প্রশ্ন আমার বিচার্য নয়। কিন্তু আমার নায়কটির আসল সমস্যা কী—বইটিতে সে বিষয়ে যথেষ্ট বলা হয়েছে। নিজের 'উচ্চ শিক্ষা' নিয়ে কি করবে, উচ্চশিক্ষার মহান আদর্শের খাতিরে যৌবনের সেরা বছরগুলি সাধনায় খরচ করে দেশবিদেশ থেকে সঞ্চয় করা বিজ্ঞানের জ্ঞান এদেশে কিভাবে কোন কাজে লাগালে কিছু পয়সাও আসবে, তার স্বপ্ন তার সাধনাও সফল হবে—এই নিয়ে আমার নায়কটি ফাঁপরে পড়েছে। শিক্ষাদীক্ষার সার্থক প্রয়োগের সুযোগ সুবিধার অভাবের চাপে একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির এদেশের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে খানিকটা নতুনভাবে শিক্ষা প্রচেষ্টায় নামার অর্থ গ্রামাঞ্চলে শিল্প বিস্তারের প্রচেষ্টা হবে কেন? কলকাতা থেকে দূরে নিজের সুবিধাজনক স্থানে রেলস্টেশনের ধারে কারখানা খোলার জন্য কি অচ্যুতবাবু আমার নায়কের কাজের মনগড়া অর্থ করেছেন?

'জমিদার-নন্দন-'এ অচ্যুতবাবুর আপত্তির কারণটা বুঝলাম না। অন্য কোন ধনীর উচ্চ শিক্ষিত নন্দনকে নায়ক করলেও গুণের সার্থক প্রয়োগের সমস্যা থেকে যেত—কেবল কাহিনী, পরিবেশ ও চরিত্র হতো অন্যরকম।

অচ্যুতবাবুর সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা শুরু করার আগে একটা কথা বলে নিই। অচ্যুতবাবুর বিচার-বিশ্লেষণের নীতি ও সাধারণ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লিখলেও কেউ যেন এই সিদ্ধান্ত করে বলবেন না যে, আমি লেখাটির গুরুত্ব বা মূল্য সম্পর্কে সচেতন নই। লেখাটি প্রকাশ করে অচ্যুতবাবু আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। লেখাটি পড়ে অচ্যুতবাবুর সততা ও মননশীলতা সম্পর্কে এতটুকু সন্দেহ থাকে না। এরূপ লেখা এবং লেখাটি নিয়ে আলোচনা আমাদের চিন্তার অনেক অপূর্ণতা ও অশুদ্ধতা দূর করতে সাহায্য করে।

প্রকৃতপক্ষে, বাংলা প্রগতি সাহিত্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি যে আশাবাদী—এরূপ সমালোচনা যে প্রকাশিত হয় সেটা তার অন্যতম একটি কারণ।

সততা ও স্বচ্ছতা এই লেখাটির একটি প্রধান গুণ। বিচারবিবেচনা করে যা সত্য বলে জেনেছেন পরিপূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সহজভাবে তিনি আমাদের সামনে তা ধরে দিয়েছেন। এই গুণটাই অন্য হিসাবে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়—সমালোচনার ভুলত্রুটি দুর্বল অসরল সমালোচনার চেয়ে বেশি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তাই বাধ্য হয়ে প্রতিবাদ জানাতে হচ্ছে যে, অনেক দামী কথা বলে থাকলেও বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে অচ্যুতবাবুর দৃষ্টিভঙ্গি বিভ্রান্তিকর। "অভিজ্ঞতার বাড়া শিক্ষা নেই" সত্য

কথাই। কিন্তু পাঠক সমাজ নাড়া খাচ্ছে না, সাড়া দিচ্ছে না, গ্রহণ করছে না—এটাই কি বাংলার প্রগতিবাদী লেখকদের অভিজ্ঞতার শিক্ষা? পাঠক পাঠিকা—অর্থাৎ দেশের লোকের উপেক্ষা বা খাতিরটাই সাহিত্যের সার্থকতার নিরিখ। বাংলার লেখকরা অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষা লাভ করেছেন? লোকের মুখ চেয়ে বাংলার লেখকেরা দিশেহারার মতো একবার "প্রচারধর্মী" এবং একবার "সূক্ষ্মভাবে আঙ্গিক-সর্বস্ব" হয়ে যাচ্ছেন!

অচ্যুতবাবুর এ সিদ্ধান্ত মানতে পারলে আমি নিজে অন্তত চিরদিনের জন্য লেখা বন্ধ করে সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে গিয়ে বড়বাজারে মশলার দোকান নিতাম।

দেশের লোকের গ্রহণ বা বর্জনের প্রশ্নটা মোটেই তুচ্ছ নয়—লেখকের কাছে বরং সেটাই প্রধান কথা। দেশের জন্যই তো লেখক লেখেন। কিন্তু লেখক কি নিজের স্বার্থে লেখেন? দেশের লোকের আদর আর অনাদরের হিসাবটা কি লেখক কষবেন নিজের স্বার্থের মানদণ্ডে?

নিজের স্বার্থে পাঠকদের কাছে পাত্তা পাবার জন্য "প্রচারধর্মী" হয়ে সাহিত্যের আসরে নেমে সুবিধা হচ্ছে না দেখে "অভিজ্ঞতার শিক্ষা" স্বীকার করে পাঠকের মন যোগানোর জন্য ভোল পাল্টে লেখক "সূক্ষ্মভাবে আঙ্গিক-সর্বস্ব" হবেন?

অচ্যুতবাবু কী করে বাংলার লেখকদের এরকম ছোটলোক (খারাপ লোক অর্থে—গরীব চাষী মজুর অর্থে

নয়) ভাবতে পারলেন কল্পনা করতেও আমার বিস্ময়ের সীমা থাকছে না।

লেখক কে? পিতার মতো যিনি দেশের মানুষকে সন্তানের মতো জীবনাদর্শ বুঝিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করার ব্রত নিয়েছেন। পিতার মতো, গুরুর মতো জীবনের নিয়ম অনিয়ম, বাঁচার নিয়ম অনিয়ম শেখান বলেই অল্পবয়সী লেখক-শিল্পীও জাতির কাছে পিতার মতো, গুরুর মতো সম্মান পান। দেশের মানুষের মন যোগাতে চেয়েছিল বলে কি আমাদের কিশোর কবি সুকান্তকে দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা এত ভালোবাসে এত সম্মান করে? দেশের মানুষকে সন্তানের মতো দেখে কাব্যের মারফতে তাদের মানুষ করার ব্রত নিয়েছিল বলেই কিশোর কবিকে জাতি পিতার আসনে বসিয়েছে।

এটাই আসল কথা। দেশের লোকের সস্তা খাতিরকে লেখক-শিল্পী খাতির করেন না। দরকার হলে দেশের মানুষকে কান মলে শাসন করার অধিকার খাটাতে লেখক-শিল্পীর দ্বিধা বা ভয় হবার কথা নয়। তেতো ওষুধ খেতে পচ্ছন্দ করবে না বলে বাপ কি রুগ্ন শিশুকে ওষুধ খাওয়ানো থেকে বিরত থাকেন? নানাভাবে মন ভুলিয়ে ধমক দিয়ে শাসন করে ওষুধ খাওয়ান।

কাজেই বাংলার লেখকদের "অভিজ্ঞতার শিক্ষা" "মনস্তত্বগত" কারণে তাঁদের সৃষ্টিতে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটা প্রভৃতি বিচার অচ্যুতবাবু যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে

করেছেন তা সঠিক ধরে নিলে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হবার বদলে চরম হতাশা জাগাই স্বাভাবিক।

অচ্যুতবাবুর আঙ্গিকের বিচারও ত্রুটিপূর্ণ।

'ইতিকথার পরের কথা'র চরিত্রগুলি 'আধা-নিউরোটিক কৃষক' আর 'পুরো নিউরোটিক জমিদার-নন্দন' হয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা—লেখকের নীরব থাকার নীতি অনুসরণ করেই যে আমি এ বিষয়ে কিছু বলবো না তা নয়, বলবার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু আঙ্গিক বিচারের যে নীতি অচ্যুতবাবু এখানে তুলে ধরেছেন আমি সেটা ভুল মনে করি।

অচ্যুতবাবু বলেছেন, "বৃহত্তর জীবন-সত্যকে রূপায়িত করতে হলে জীবনের খণ্ড খণ্ড অংশ একত্র করলেই চলবে না।......খণ্ডগুলিকে সমন্বিত করে এমন একটা সামগ্রিক রূপ দিতে হবে যাতে এই সামগ্রিকতা যে কোন খণ্ড অংশকে অতিক্রম করে যাবে।"

তাঁর মতে, জীবনের খণ্ডিত অংশগুলি সমন্বিত করে তাতে এই সামগ্রিকতা না-দেওয়ার কৌশল কেবল সমাজের সংকীর্ণ ক্ষয়িষ্ণু একটা অংশের জীবন-সত্যকে (বাংলার মধ্যবিত্ত) রূপ দেওয়ার পক্ষে 'অদ্ভুত উপযোগী'। জীবনের খণ্ড খণ্ড অংশ একত্রিত করে এই সামগ্রিকতা এনে দেওয়া বা না দেওয়াটা কি ব্যাপার? আমি তো জানি জীবনের খণ্ড খণ্ড অংশ বাছাই করে শিল্পকলা খাটিয়ে

সাজিয়ে গেঁথে দেওয়াই গল্প উপন্যাস লেখার আঙ্গিকের মোট কথা—তারপর আর কি করার থাকে লেখকের?

জীবনের খণ্ডিত অংশগুলি লেখকের বেছে নেবার কথা খেয়াল্ করেননি বলে অচ্যুতবাবু বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গিয়েছেন। সমাজের খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন অংশের জীবন-সত্যই হোক, আর সমাজের বৃহত্তর জীবন-সত্যই হোক, সে সত্য কতটুকু রূপায়িত হবে তা নির্ভর করবে জীবনের খণ্ডগুলি বেছে নেওয়ার উপর। এই বেছে নেওয়ার কাজটা ঠিকমতো না হলে হাজার শিল্পকৌশল প্রয়োগ করেও লেখক সত্যকে রূপ দিতে পারবেন না।

জীবনের খণ্ডাংশগুলি স্বভাবতঃই বাছাই হবে লেখকের চেতনা ও অভিজ্ঞতা অর্থাৎ জীবন-দর্শন অনুসারে। জীবন-সত্যকে রূপায়িত করার জন্য তাই প্রধান কথা হলো লেখকের ওই জীবন-সত্যটা ধরতে পারা।

শুধু বুদ্ধি দিয়ে জানা নয় যে, সমাজজীবনে ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্গঠনের কাজও চলছে—ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়াটা কি ভাবে ঘঠছে কেন ঘটছে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানা, চেতনায় উপলব্ধি করা।

মহাত্মা গান্ধীকে তাঁর খণ্ডগুলির যোগফল হিসাবে দেখলে অবশ্যই তাঁকে নিউরোটিক মনে হবে, কিন্তু গান্ধীচরিত্র ঠিকমতো ফোটাতে গেলে বাছাই করে নিতে হবে তাঁরই বিশেষ কতগুলি খণ্ড। কোন খণ্ডগুলি বেছে গান্ধীচরিত্রকে কেমন রূপ দেবেন তা নির্ভর করবে কে কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে

গান্ধীজিকে দেখে কোন খণ্ডগুলি বাছাই করবেন। একজন মার্ক্সবাদী এবং একজন অন্ধ গান্ধীভক্তের খণ্ড বাছাই করা স্বভাবতঃই একরকম হবে না এবং দু'জনের আঁকা গান্ধীচরিত্রও একরকম হবে না।

প্রিয়-বিরহকাতুরা রমণীর চব্বিশ ঘণ্টার চিন্তার তালিকা পড়লে হাসি পাবে সত্যই। কিন্তু এই উদাহরণটি তুলে ধরার মধ্যেও জীবন সত্য রূপায়ণে আঙ্গিকের ভূমিকা সম্পর্কে অচ্যুতবাবুর বিভ্রান্তি ধরা পড়ে। বিরহকাতুরার চব্বিশ ঘণ্টার চিন্তার মধ্য থেকে বাছাই করা চিন্তা নিয়ে ওস্তাদ শিল্পী কেন অনবদ্য সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না, যা পড়লে হাসি পাওয়ার বদলে অভিভূত করে দেবে? বিবহকাতুবার মনে কি প্রিয়তম ও অন্যান্য মানুষের সঙ্গে বিচিত্র বাস্তব জীবন সংগ্রামের স্মৃতি এবং আরও অনেক বাস্তব চিন্তা রেখাপাত করে না? কেউ যদি বিরহকাতুরার কেবল ছাঁকা বিরহ-বেদনা ঘটিত চিন্তা বেছে নিয়ে ব্যথার কাব্য রচনা করেন সেটা তাঁর জীবন-দর্শনের বৈশিষ্ট্যের জন্যই করবেন।

বন্ধুবর গোপাল হালদারের সাহিত্য সম্পর্কে অচ্যুতবাবু বলেছেন: 'গোপালবাবুর আঙ্গিকে তাঁর বুদ্ধিজীবী সত্তার স্বাক্ষর রয়েছে।' তার ফলে তাঁর উপন্যাসে কি ঘটেছে তাও সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন এবং গোপালবাবুর উপন্যাসের চরিত্রগুলি কেন মেটাফিসিক্যাল, কেন তারা বদলায় না, কেন "কাহিনীর পর কাহিনী যোগ হয়ে যায়

কিন্তু তাতে জীবনের কোন অন্ধকার কোণে নতুন আলোকপাত ঘটে না”—এর কারণ অচ্যুতবাবু বলছেন—এটাই তাঁর “আঙ্গিকের বিশেষত্ব”।

অচ্যুতবাবু অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অনুযোগও দিয়েছেন যে, গোপালবাবু তাঁর বই-এ একটিমাত্র কৃষক চরিত্রও আনতে সাহস পাননি।

অথচ অচ্যুতবাবুর কাছে এ সত্য স্পষ্ট নয় যে, বুদ্ধিজীবী সত্তার জন্যই গোপালবাবুকে জীবনের এমন অংশগুলি বেছে নিতে হয় যাতে তিনি তাঁর ডায়ালেকটিক চিন্তাধারাকে কাহিনীর পর কাহিনী সাজিয়ে প্রকাশ করতে পারেন।

আঙ্গিকের ভূমিকা সম্পর্কে বিভ্রান্তির জন্যই বর্তমান প্রগতি সাহিত্য সম্পর্কে অচ্যুতবাবু “আশান্বিত” হবার কারণে খুঁজে পাচ্ছেন না। প্রবন্ধের গোড়াতেই তিনি প্রগতিশীল শিল্পের স্থূল সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে সমাজ-জীবনের বাস্তবতার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সাহিত্যের বাস্তবতা বিচার করতে নেমে ওই বাস্তবতাকে পিছনে ঠেলে দিয়েছেন। সাহিত্যের বাস্তবতার বিচার অর্থাৎ সমাজ-জীবনের বাস্তবতায় যে জীবন-সত্য সাহিত্যে তা কিভাবে কতটুকু রূপায়িত হচ্ছে বা হচ্ছে না তার বিচার যে সর্বদা সমাজ-জীবনের বাস্তবতার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে করা দরকার এটা খেয়াল না রাখায় অচ্যুতবাবুর বিচার বিশ্লেষণ অবৈজ্ঞানিক হয়ে গিয়েছে।

এদিকে আবার সঠিক জীবন-দর্শনের গুরুত্ব সম্পর্কে অচ্যুতবাবু মোটেই অচেতন নন। বর্তমান বাংলা প্রগতি

সাহিত্যের স্বরূপ এবং লেখকদের সমস্যা যেমন নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন তেমনি সুন্দর ও সঠিকভাবে এই সমস্যার সমাধানও বাৎলিয়েছেন: আরও বেশি করে জীবনকে জানা, আরও একান্তভাবে নিবিড়ভাবে জীবনের সান্নিধ্যে যাওয়া ও তার গতি-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করা। আঙ্গিকের জন্যও তিনি পূর্বসূরীদের সাহিত্য পড়তে বসে সঠিকভাবেই মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, সে আঙ্গিকে আজকের লেখকের কাজ হবে না।

অচ্যুতবাবু লিখেছেন, "আসল কথা হলো, প্রগতিশীল লেখকদের আজকে এমন একটা সমস্যার সামনে পড়তে হয়েছে যা কোন কালের কোন লেখকের উপলব্ধি করতে হয়নি। লেখকেরা চিরদিনই তথ্যের থেকে তত্ত্বের দিকে যান; আজকের লেখকদের পরিক্রমণের পথ হলো তত্ত্বের থেকে তথ্যের দিকে। ফলে তথ্যের মধ্যে তত্ত্বকে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সীমায় আবিষ্কার করতে না পারার জন্যে লেখকেরা একবার স্থূলভাবে প্রচারধর্মী হয়ে পড়ছেন, আর একবার সূক্ষ্মভাবে আঙ্গিক-সর্বস্ব হয়ে পড়ছেন। এর একমাত্র সমাধান হলো আরও বেশি করে জীবনকে জানা, আরও একান্তভাবে নিবিড়ভাবে জীবনের সান্নিধ্যে যাওয়া ও তার গতিপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করা। আঙ্গিকের জন্য পূর্বসূরীদের সাহিত্য পড়তে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে সে-আঙ্গিকে লেখকের কাজ হবে না। আর একটি কথা, শ্রমিক-কৃষকের জীবনের পটভূমিকা না

হলে প্রগতিশীল সাহিত্য হয় না, এ ধারণা ভুল। জীবনের যে কোন একটি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে রোগ এবং রোগারোগ্যের প্রচেষ্টা মিলিয়ে আধুনিক সমাজব্যবস্থার যে-সমস্যা তার প্রতিফলন আবিষ্কার করা যায়।”

এত অল্প কথায় অচ্যুতবাবু সমকালীন বাস্তবতার জন্য লেখকদের সমস্যা কি ও তার সমাধান কি তা ধরে দিয়ে এবং সমগ্র প্রবন্ধটির বিচার-বিশ্লেষণে দৃষ্টির গভীরতার পরিচয় দিয়েও আসল বিচারে কেন গোলমাল করে ফেললেন ভেবে প্রথমটা আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আবিষ্কার করলাম যে, অনেক আনুষঙ্গিক সত্যকে সঠিকভাবে জেনেও সেইগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রয়োগ করতে না পারায় এই বিভ্রাট ঘটেছে।

তিনি বলছেন “আসল কথা হলো: প্রগতিশীল লেখকদের আজকে এমন একটা সমস্যার সামনে পড়তে হয়েছে যা কোন কালের কোন লেখককে উপলব্ধি করতে হয়নি।” কিন্তু আজকের লেখকদের সমস্যাটা বিশেষ কেন—আজকের বাস্তবতা বিশেষ বলেই তো? সেইজন্যই আজ লেখকের প্রয়োজন জীবনের ঐতিহাসিক গতি-প্রকৃতির মূল নিয়ম জানার সঙ্গে বাস্তব জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানা এবং তার গতি-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করা।

বেশ কথা। আজ বাংলার সমাজ-জীবনের ভাঙাগড়ার বাস্তবতা কি, বাঙালীর জীবন-সত্যটা কি? কি স্বরূপ জীবনের অন্তর্নিহিত গতি প্রকৃতির?

অচ্যুতবাবু সমাজ জীবনের বাস্তবতা মোটামুটি দেখিয়েছেন—বর্তমান সমাজ এমন একটা যুগ পরিবর্তনের আবর্তসংকুল সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে যে, তার আভ্যন্তরীণ শ্রেণীদ্বন্দ্ব একটা চরম রূপ নিয়ে উপস্থিত। শোষিতশ্রেণী সমূহ একটা শ্বাসরোধকারী সামাজিক অবস্থানের থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রতিনিয়ত প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী-শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত। আজকের এই সামাজিক সত্যটি জীবনের যে-কোন স্তরের যে-কোন মানুষের সত্তার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট। এই অত্যন্ত সাদা-মাটা সত্যটিকে স্বীকৃতি দান বর্তমান প্রগতি সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ।

'শোষিতশ্রেণী সমূহের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সংগ্রামের গতি-প্রকৃতি কি তা উপলব্ধি করে প্রগতিশীল লেখকের পক্ষে জীবনের কোন্ খণ্ডিত অংশগুলি বেছে নেওয়া সম্ভব এবং কোন আঙ্গিকে কিভাবে তা কতখানি রূপায়িত করা সম্ভব নির্ভুলভাবে এটা বিচার না করে প্রগতি সাহিত্যের সামগ্রিক গতি-প্রকৃতি ও শিল্পমূল্য সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

বাস্তবতাকে অতিক্রম করে মিথ্যা কল্পনার রাজ্যে চলে যাবার সুযোগ ভাববাদী লেখকের আছে, ভাববাদী আদর্শগত জীবন দর্শনকে রূপ দেবার জন্য তিনি যত খুশি কল্পনার রং চাপাতে পারেন। কিন্তু বস্তুবাদী প্রগতিশীল লেখক বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন না। বস্তুবাদী লেখক অবশ্যই বাস্তবতার রিপোর্টার নন, তিনি শিল্পী—তিনিও কল্পনার রঙে-রসেই তাঁর কাহিনী রূপায়িত করবেন,

কিন্তু মিথ্যার সঙ্গে তাঁর কল্পনার কারবার থাকবে না। এই জন্যই তাঁর বাস্তবজীবনের গতি-প্রকৃতি ভালো করে জানা দরকার—তাঁর কল্পনা যাতে বাস্তবতাকে অতিক্রম করে ফাঁকা আদর্শবাদিতার মিথ্যায় পরিণত না হয়, জীবন-বিরোধী হয়ে না ওঠে।

অচ্যুতবাবু কি জানেন বাংলা প্রগতি-সাহিত্য প্রচারধর্মী হয়েছিল জীবন-বিরোধী মিথ্যা আদর্শবাদিতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য? এটা ক্রটি, বাস্তবজীবনের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবেরই সুস্পষ্ট নিদর্শন কিন্তু মিথ্যাকে তুলে ধবার চেয়ে সাহিত্যে প্রচারধর্মী হওয়া ঢের ভালো—সমাজ ও সাহিত্যের রূপান্তর গ্রহণের বিশেষ স্তরে প্রচারধর্মী হওয়াটাই তাই সাহিত্যের প্রগতি লক্ষণ এবং আশার কথা হয়ে দাঁড়ায়।

এই প্রচারধর্মিতা থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা ও ব্যাকুলতা তা' সূক্ষ্ম আঙ্গিক—সর্বস্বতার রূপই নিক বা অন্য যে কোন রূপই নিক, সেটাও তখন হয় সাহিত্যে প্রগতি বজায় থাকার লক্ষণ এবং আশার কথা।

বাংলার সমাজ জীবনের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে, শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রেণী সম্পর্কের বর্তমান রূপ এবং ঐতিহাসিক গতি-প্রকৃতির বিচার বিশ্লেষণের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ করলে অচ্যুতবাবু দেখতে পেতেন সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মধ্যে প্রগতিসাহিত্যের বর্তমান রূপটাই অনিবার্য ছিল এবং এই প্রগতিসাহিত্য সম্পর্কে

হতাশার কিছুমাত্র কারণ নেই। বাংলার প্রগতি সাহিত্যের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, পথটা দুর্গম ও এলোমেলো হলেও এ সাহিত্য সামনের দিকেই এগিয়ে চলেছে।

আত্মসন্তুষ্টি মারাত্মক। হতাশ হবার কারণ না থাকলেও চোখ-বোজা আত্মসন্তুষ্টির বিপদ সম্পর্কে সচেতন করার দিক থেকে অচ্যুতবাবুর প্রবন্ধটি মূল্যবান। আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

আমিও সেই অনাগতের প্রতিক্ষায় আছি যিনি একদিন মহান সৃষ্টির মধ্যে বাংলা সাহিত্যের নবতম রূপ সার্থকভাবে রূপায়িত করতে পারবেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না সেই অনাগত আকাশ থেকে নেমে আসবেন, বাঙালীর জীবন ও সাহিত্যের বাস্তব যাত্রাপথেই তার আবির্ভাব ঘটবে।

"বক্সা ক্যাম্পে শিল্পী-সাহিত্যিক"

আমি বিশ্বাস করি, বিনা বিচারে মানুষকে আটক রাখার আইনটা এদেশের মানুষকে পরাধীনতার গ্লানি সব চেয়ে বেশি অনুভব করায়। একপেশে স্বেচ্ছাচারিতার, শাসক ও শাসিতের মধ্যে অসৎ সম্পর্কের এমন সুস্পষ্ট নগ্ন অভিব্যক্তি আর আছে কিনা সন্দেহ। গণতন্ত্র এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা যে সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে তার তর্কাতীত প্রমাণ হলো প্রকাশ্য বিচার ছাড়াই মানুষকে বন্দী করার আইন।

অনেকে এই আইনটির স্বরূপ তুলে ধরতে রাজবন্দীর সংখ্যা তুলে ধরেন। আমার মতে, বন্দীর সংখ্যাটা আন্দোলনের ব্যাপ্তির স্বরূপ নির্দেশ করে : বন্দীর সংখ্যা লক্ষ হোক বা একজন হোক বিনাবিচারে আটক রাখার আইন চালু থাকার আসল তাৎপর্যের এতটুকু এদিকওদিক তাতে হয় না।

মনে আছে, ছাত্রাবস্থায় ও সাহিত্যিক জীবনের প্রথমদিকে ইংরেজের নিরাপত্তা আইনটা মনে করতাম আমার দেশের চরম অপমান, এ দেশের লোকের বিচারবুদ্ধি, মানবতা ও ন্যায়বোধ সম্পর্কে সীমাহীন অবজ্ঞার ঘোষণা। মনে হতো, আমরা আইন ও শৃঙ্খলা মানি, গণ-আন্দোলনের পথে ছাড়া অন্যায় আইন পর্যন্ত ভাঙি না, প্রকাশ্য বিচার মানি, তবু বিনা বিচারে আটক রাখার আইন দরকার—এ মিথ্যা নিন্দা আর অপমান কেন? এ প্রশ্নের আসল

মানে ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হলো। ক্রমে বুঝতে পারলাম, বিনা বিচারের আইনটা, দেশবাসীর আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি স্বভাবনিষ্ঠ, ন্যায়বোধ, যুক্তিবোধ, নীতিবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে শাসকগোষ্ঠির অবজ্ঞার নিদর্শন নয়, সভয় শ্রদ্ধারই প্রমাণ! জনসাধারণের ন্যায়বোধ, নীতিবোধ, বিচারবুদ্ধিতে ভেজাল থাকে না, গোষ্ঠিস্বার্থ ঠিক সেই জন্যেই প্রকাশ্য বিচার এড়িয়ে চলতে চায়।

ইচ্ছা বা সংকল্প থাকে মানুষের মনের গহনে। ধ্বংসাত্মক কাজের ইচ্ছা বা সংকল্প আছে—শুধু এইটুকু ঘোষণা করে একজন মানুষেব স্বাধীনতা হরণ করা চলে কিন্তু গহন মনের নিছক ইচ্ছা বা সংকল্পকে তো প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণ করা যায় না। কিছু বাস্তব প্রমাণ দরকার হয়।

যে অজুহাতেই হোক, একটা অন্যায়কে পোষণ করলে তা থেকে যে শাখা প্রশাখা গজায়, তার নিদর্শন পাই বহু নিরাপত্তা-বন্দীকে বক্সা ক্যাম্পে প্রেরণ করার মধ্যে। সরাসরি ইংরাজ আমলের সেই বক্সা ক্যাম্প, যার স্মৃতি আজও আমাদের মনে কাঁটার মতো বেঁধে, ক্ষোভ জাগায়। দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলে নিরাপত্তা বন্দীদের সম্পর্কে দেশবাসীর উদাসীনতা আসবে, এই হীন মনোবৃত্তি ও আজগুবি ধারণা থেকে আবার সেই বক্সা ক্যাম্পকে ব্যবহার করা হবে, ইংরেজের তৈরি সেই বক্সা ক্যাম্পটাই আবার আমাদের জাতীয় আত্মসম্মান বোধকে আঘাত করার সুযোগ পাবে, এটা সত্যই অবিশ্বাস্য ছিল।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, চিন্মোহন সেহানবীশ, পারভেজ শহিদী, সুনীল বসু, দ্বিজেন্দ্র নন্দী প্রমুখ লেখক, কবি, শিল্পী ও সংস্কৃতি-কর্মীদেরও বক্সায় পাঠানো হয়েছে। প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে, এবং বহু সাহিত্য-সভায়, শিল্প-সাহিত্যের আদর্শ বিচারের আলোচনা বৈঠক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মারফতে এঁদের সঙ্গে আমার পরিচয়। আমি সাহিত্যিক মানুষ, একটু তাড়াতাড়ি মানুষের ভেতরটা খানিক গভীরভাবে জানবার ক্ষমতা দাবি করলে কি অহঙ্কার প্রকাশ করা হবে? শিল্প-সাহিত্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করা, মানুষের সেরা সম্পদ সংস্কৃতিকে ক্ষয় ও অপঘাতের বিপদ থেকে বাঁচিয়ে, নূতনতর মহত্তর বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা ও কল্পনাই এঁদের মনপ্রাণ জুড়ে ছিল। বাংলার শিল্প-সাহিত্যে নতুন সৃষ্টি দিয়ে এঁরা প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন, আলোচনায় সমালোচনায় অংশ নিয়ে প্রমাণ দিয়েছেন গভীর ও তীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তির এবং নিয়মিত অক্লান্ত পড়াশোনার, সাংস্কৃতিক কাজে হাতে-নাতে খেটে পরিচয় দিয়েছেন কর্মশক্তির। সত্য কথা বলি, এঁদের অক্লান্ত কর্মপ্রেরণা ও বই পড়ার আগ্রহ ও বহর দেখে রীতিমতো ঈর্ষা বোধ করেছি।

শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চা একান্তভাবেই প্রকাশ্য ব্যাপার। গোপন ষড়যন্ত্রের এতটুকু স্থান নেই। ছবি আঁকি, গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ লিখি, গান গাই, অভিনয় করি, বক্তৃতা দিই—গোপনে করা দূরে থাক, পাঠক শ্রোতা দর্শক

পর্যন্ত বেছে নেবার উপায় নেই! সোজাসুজি খোলাখুলি আমার দেশের সকল মতের সকল রুচির সকল মানুষের সামনে তুলে ধরে দিতে হবে আমার সকল রকম সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা। দেশের মানুষই তাই শিল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার একমাত্র বাহক এবং বিচারক : দেশবাসীর গ্রহণ ও বর্জনই এক্ষেত্রে একমাত্র গ্রহণযোগ্য আইন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রয়োগ তাই সভ্যজগতে এত বড় অনিয়ম বলে গণ্য হয়।

বাংলার একজন সাহিত্যিক হিসাবে আমি এই প্রশ্ন ও প্রতিকারের দাবি তুলছি : সাধারণ আইনে প্রকাশ্য আদালতের বিচার যখন দেশের মানুষ আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত, তখন বিনা বিচারে আটক রাখার আইন কেন? বিদেশী শাসকের নামে রাস্তার নাম পর্যন্ত যখন অপমানজনক বিবেচিত হচ্ছে, তখন জাতীয় অপমানের প্রতীক ইংরেজের তৈরি বক্সা ক্যাম্পে বন্দীদের আটক রাখার ব্যবস্থাই বা কেন? শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিবিদেরা যখন সম্পূর্ণরূপে গণমত ও গণবিচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, গোপন কার্যকলাপের কিছুমাত্র সুযোগ সুবিধা যখন তাঁদের বিশেষ পেশায় নেই, এবং শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণটাই যখন নির্ভর করে শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিবিদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার উপর— তখন বাংলার প্রিয়তম শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিকর্মীরা বক্সা ক্যাম্পে আটক কেন?

সাহিত্যিক ও গুণ্ডামি

সাহিত্যিক শ্রীযুত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর কিছুদিন আগে হাওড়ায় যে বর্বরোচিত আক্রমণ করা হয়, তা এমন এক স্তরের গুণ্ডামির নিদর্শন যে, এই ঘটনা যে-কোন বাঙালীকে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ করবে। নিজের মত ও বিশ্বাসের জন্যে কোন সাহিত্যিকের সরকারী কৃপাই লাভ হোক বা গুণ্ডার কৃপাই লাভ হোক, সমস্ত সাহিত্যিককে—তথা সমস্ত দেশবাসীকে—সে লাঞ্ছনা-অপমানের অংশীদার হতে হয়; কারণ, এই ধরনের বর্বরতা সাহিত্যিকের মৌলিক অধিকারে কুৎসিত হস্তক্ষেপ—যে অধিকার গ্রহণ বা বর্জন, সাহিত্যিকের একমাত্র বিচারক দেশবাসীই তাকে দান করেছে।

ভারতের মর্মবাণী

ঐতিহাসিক ঘটনার ধারাবাহিক বাস্তবতাকে আশ্রয় করে ভারতের দেড়শ' দু'শ' বছরের জাতীয় জীবনের মর্মকথাকে মঞ্চের উপর নৃত্য-নাট্যের স্বল্প পরিসরের মধ্যে সার্থক রূপ দেওয়া কি সম্ভব? ভারতীয় গণ-নাট্যসঙ্ঘের কেন্দ্রীয়বাহিনীর অভিনীত 'ভারতের মর্মবাণী' প্রত্যক্ষ করবার আগে এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ছিল। কারণ, নৃত্য-নাট্য সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, ভাব ও কল্পনাই এর প্রাণ, ঘটনা তার প্রতীক মাত্র; ভাব ও কল্পনার রূপকধর্মী সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনার উপরেই নৃত্য-নাট্যের সার্থকতা নির্ভর করে। নৃত্য-নাট্যের সরলতা, স্পষ্টতা ও বলিষ্ঠতা আমাদের কাছে স্থূলতার সামিল। আমাদের ধারণা এই যে, নৃত্যগীত সমন্বিত প্রতীক-নাট্যে এই তিনটি গুণের সমাবেশ ঘটলে ভাবের গভীরতা ব্যাহত হয় এবং অবদানের সমগ্রতা রক্ষা করা যায় না। 'তাসের দেশ' ও সাধারণ 'রামলীলা' অভিনয়ের পার্থক্য মনে রাখলে এই সিদ্ধান্তে আসাই স্বাভাবিক। এ কথা খুবই সত্য যে, 'তাসের দেশ'-এর টেকনিক অবলম্বন করলে ঐতিহাসিক ঘটনাশ্রয়ী ধারাবাহিকতার কাঠামো বর্জন করতে হয়, সময়-নিরপেক্ষ সমগ্র ভাব-সংঘাতের চুম্বক ভিত্তি করে, তাকেই

রূপ দেবার চেষ্টা করতে হয়। অপরপক্ষে, 'রামলীলা'র টেকনিক নিলে ঘটনা সাজিয়ে সাজিয়ে গড়ে তুলতে হয় বিস্তৃত কাহিনী, ঘটনার তাৎপর্য গেঁথে গেঁথে সম্পূর্ণতা দিতে হয় মূল ভাবধারাকে। এক্ষেত্রে ঘটনাই সর্বস্ব, কাজেই প্রত্যেকটি ঘটনাকে দিতে হয় কলাসম্মত গঠন ও রূপ। নৃত্য-নাট্য আবার বেশি দীর্ঘ হলে জমে না।

এদিক দিয়ে বিচার করলে তবেই ঠিকমতো উপলব্ধি করা যায়, 'ভারতের মর্মবাণী' নৃত্য-নাট্যটির পরিকল্পনা ও অভিনয় ভারতীয় গণ-নাট্যসঙ্ঘের কত বড় কৃতিত্বের পরিচয়। ইংরেজের এদেশে পদার্পণের সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে উচ্চাঙ্গের নৃত্য-নাট্যে রূপায়িত করার একমাত্র যে টেকনিক, এঁরা সেটি খুঁজে বার করে কাজে লাগিয়েছেন; যার দ্বারা নৃত্য-নাট্যে, ঘটনার বাস্তব নির্দেশ ও ভাব-সংঘাতের রূপকধর্মী অভিব্যক্তির সমন্বয় ঘটানো সম্ভব হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক-নৃত্য, পল্লীগীতি প্রভৃতির সরলতা, স্পষ্টতা ও বলিষ্ঠতা এঁরা এদের নৃত্য-নাট্যে সঞ্চারিত করেছেন। সব রকম বাহুল্য, জটিলতা ও আড়ম্বর বর্জন করা হয়েছে। সুর ও ধ্বনি সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে সাধারণ কয়েকটি যন্ত্র।

পল্লী-চারণের গাথা, লোক-নৃত্য ও লোক-সঙ্গীতের ছন্দ সুর এবং ধ্বনি, ভঙ্গি আলোকপাত ও অপূর্ব অভিনয়-নৈপুণ্যের সমন্বয়ে 'ভারতের মর্মবাণী' হয়েছে

মর্মস্পর্শী। বুদ্ধিবিলাসী থেকে সাধারণ দর্শক, সকলের কাছেই এর আবেদন সমান বলিষ্ঠ। আত্মকলহের সুযোগে এদেশে ইংরাজের প্রতিষ্ঠালাভ, দারিদ্র্য, জমিদারের অত্যাচার, যন্ত্রযুগ, রেলপথ, কারখানা, বণিকের শোষণ, যুদ্ধ, নতুন দুর্দশা, জাতীয় নেতাদের কারাবাস, অনৈক্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আমলাতন্ত্রের আশ্রয়পুষ্ট মজুতদার ও অতিলোভী ব্যবসায়ীর পেষণে নিষ্পিষ্ট জনগণ, সমস্তই নৃত্য-নাট্যটিতে রূপ পেয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে আরম্ভ ও শেষ নয়। তাহলে 'ভারতের মর্মবাণী' অসম্পূর্ণ থেকে যেত। গোড়ায় পল্লীচারণের গাথায় আছে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী, সমাপ্তিতে জনগণের মুক্তিকামনা রূপ নিয়েছে জাগ্রত জনগণের সমবেত দাবীর কাছে দেশী ও বিদেশী অত্যাচারীর পরাজয়ে।

নৃত্য-নাট্যটির পূর্বে বাংলা, গান্ধার, অন্ধ্র, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের নাচ ও গান পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে ওঙ্কার আহ্বান, লম্বার্দি নৃত্য, ধোবিনৃত্য, নবান্ন উৎসব, রামলীলা ইত্যাদিতে। এর দ্বারা লোক-নৃত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয়হীন দর্শকের মনও প্রস্তুত হতে পেরেছে। এটা খুব বড় কথা। লোক-কলার মারফতে নতুন চিন্তা ও বর্তমান যুগের সমস্যাগুলিকে সামনে ধরবার জন্যে লোক-কলার খাঁটি রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, যাতে আমাদেরই অবহেলায় লুপ্তপ্রায় এই জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্পদের মূল্য সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়ে উঠতে পারি।

সংস্কৃতির কোন বিশিষ্ট রূপ ও ধারাকে সংস্কারের মতো রূপান্তরহীন করে রাখলে তার কোন ভবিষ্যৎ থাকে না, তার মৃত্যু অনিবার্য। লোক-কলাকে বাঁচাবার ও লোক-শিক্ষার বাহন হিসাবে তাকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্য তখনই সফল হতে পারে, যখন জনগণের জীবনের বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা যায়, তাদেরই জীবন্ত আনন্দ-বেদনা আশা-নিরাশা সঙ্কট ও সমস্যা রূপায়িত হয়। গণ-নাট্যসঙ্ঘ এটা উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা তাই দেশের সামনে শুধু লোক-কলার কতকগুলি নমুনা ধরে দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাননি—'জাতির এই সম্পদকে রক্ষা করা চাই!' জানালে সেটা অরণ্যে রোদন হতো মাত্র। নিজেরাই তাঁরা কাজটা আরম্ভ করেছেন—দেশের সামনে শুধু আদর্শটা নয়, উপায়টাও ধরে দিয়েছেন। সকলের মন তাই নাড়া খেয়েছে, সাড়া মিলেছে।

এই কার্যে ব্রতী তরুণ ও অ্যামেচার অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিয়ে গড়া এই বাহিনীটির বয়স এক বছরও পূর্ণ হয়নি। এঁদের এই অপূর্ব অভিনয় নৈপুণ্য কোথা থেকে এল? কি এঁদের অভিনব সাফল্যের মর্মকথা? এর একটিমাত্র জবাব জানি—এঁরা শুধু শিল্প-প্রাণ নন, দেশপ্রাণও বটে। আর্টের জন্য আর্টের ধোঁয়ায় এঁদের চোখ কটকট করে না, শিল্পীর কর্তব্য সম্বন্ধে এঁদের দ্বিধাও নেই, দুর্বলতাও নেই। এই প্রসঙ্গে গণ-নাট্যসঙ্ঘের বাংলা শাখার এমনি অল্পবয়সী অ্যামেচার অভিনেতা

অভিনেত্রীদের প্রদর্শিত 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন'র কথা স্মরণীয়। এ দুটি নাটক নাট্য-জগতে কি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে কারো তা অজানা নয়। 'নবান্ন' অভিনয়ের জন্য আজ চেষ্টা করেও স্টেজ ভাড়া পাওয়া যায় না। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কর্তারা ভয় পেয়ে গিয়েছেন। অথচ এঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার কোন ইচ্ছাই গণ-নাট্যসঙ্ঘের নেই—এঁরা ব্যবসায়ী নন, লাভের টাকা শিল্পী বা পরিচালক কারো পকেটে যায় না। বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য বাংলা শাখা বোম্বাই ও পাঞ্জাবে সফর দিয়ে লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করেছিল, 'নবান্ন' অভিনয়ের কয়েক হাজার টাকা বাংলায় মহামারীর চিকিৎসায় লেগেছে।

রঙ্গালয়ের পরিচালকদের তবু এত আতঙ্ক কেন? সোজাসুজি প্রতিযোগিতার ভয় এঁদের নেই—এঁদের ভয় দর্শক সাধারণের রুচির পরিবর্তনে। কিন্তু সস্তা নাটক ও সস্তা অভিনয় দিয়ে দর্শককে ভোলাতে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের কর্তারাই বা চাইবেন কেন? আর, তাঁরা যদিই বা মুনাফার লোভে তা চান, রঙ্গমঞ্চের শিল্পীরা কেন তাতে সায় দেবেন? তাঁরা কি নূতনতর সৃষ্টিতে ও সৃষ্টির তাগিদে সাড়া দিতে পারবেন না—এতই কি জড়তাপ্রাপ্ত হয়েছেন?

এই আতঙ্ক ও প্রতিকূলতার প্রতিরোধের মধ্যেও গণ-নাট্যসঙ্ঘের আন্দোলনের ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেখতে পাই। দেশ এঁদের আন্দোলনকে সমর্থন ও গ্রহণ করেছে—সারা দেশে এঁদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে।

কথা-শিল্পী হিসাবে ভারতীয় গণ-নাট্যসঙ্ঘের কাছে একটি ব্যক্তিগত ঋণের কথা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে। নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা পাওয়ার ঋণ নয়,—ওটা শুধু আমাকেই নয়, সকলকেই ওঁরা পরিবেশন করেছেন, সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবার প্রয়োজন ছিল না। সাহিত্যিক হিসাবে আমার একটি ভীরুতা সম্বন্ধে এঁরা আমাকে সচেতন করেছেন। পাঠক সাধারণকে একটু বেশিরকম ভোঁতা ও একগুঁয়ে মনে করার প্রতিক্রিয়া, অনেক লেখকের রচনাতেই কতগুলি অনাবশ্যক সতর্কতা হয়ে দেখা দেয় নানা ভাবে, এবং সমস্ত রচনাটিকে প্রভাবান্বিত করে। লেখকের ভীরুতাই এজন্য দায়ী। সঙ্ঘের অভিনব প্রচেষ্টাকে সাধারণ দর্শক যে রকম উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, তাতে আমি উপলব্ধি করেছি যে, আমরাই, লেখক ও শিল্পীরাই, পাঠক ও দর্শক সাধারণের ঘাড়ে অযথা দোষ চাপাই, তাঁদের কতগুলি সঙ্কীর্ণতা ও বিরোধিতা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই। আসলে তাঁরা আমাদের সব রকম সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে সর্বদাই প্রস্তুত, আমরাই তাঁদের এই উদারতা স্বীকার করতে ভয় পাই। আমি বিশ্বাস করি, নিজের এই দুর্বলতা চেনার ফলে আমার লেখার উন্নতি হবে।

'পাঠকগোষ্ঠী'র আলোচনা

পরিচয় সম্পাদক সমীপেষু,

পৌষের পরিচয়ে প্রকাশিত বিষ্ণু দে মহাশয়ের পত্রখানির অকারণ তিক্ততা ও অসংযম সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। মার্ক্সীয় সাহিত্য বিচার সম্পর্কে তাঁর ভুল ধারণার মতো এই তির্যক অবিনয়ও প্রতিবাদযোগ্য। শারদীয়া সংখ্যা পত্রিকাগুলির কয়েকটি ছোট গল্প সম্পর্কে নীহার দাশগুপ্তের যে নিবন্ধের বিরুদ্ধে তাঁর পত্রাঘাত, বিষ্ণুবাবুকে এতখানি বিচলিত করার মতো কিছুই তাতে খুঁজে পেলাম না। নীহারবাবু কেবল একস্থানে লিখেছেন: "অচিন্ত্যকুমারের তীক্ষ্ণধার ভাষা ও গল্প বলার কায়দার জোরে গল্পগুলি সুখপাঠ্য হয়ে উঠলেও কোন এক কবি-সমালোচকের মতো তাঁকে হেমিংওয়ের সঙ্গে তুলনা করতে পারবো না। বলতে পারবো না, 'তাঁর গল্পের জীবন জীবনেরই মতো বিচিত্র, তিক্ত, মধুর, বিস্ময়কর মিশ্রাবেগ'।"

বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে মতের পার্থক্য ঘোষণা করা ছাড়া এর মধ্যে আর কি আছে, বিষ্ণুবাবুর কাছে যা তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে গঞ্জিত করার মতো আপত্তিকর হতে পারে!

নীহারবাবুর নিবন্ধটি ঠিক সমালোচনাও নয়, আলোচনা মাত্র। শারদীয়া সংখ্যার কতকগুলি গল্প পড়ে তিনি সংক্ষেপে তাঁর সাহিত্যিক মতামত ও পছন্দ অপছন্দের ভিত্তিতেই

গল্পগুলির মোটামুটি বিচার, পরিচয়ে দশজনের সামনে ধরেছেন—দশজনেও যাতে আলোচনা করেন। এটা সাহিত্যিক সৎপ্রচেষ্টা।

বিষ্ণুবাবুর মার্ক্সিস্ট দৃষ্টি বিকৃত না হলে নীহারবাবুর প্রবন্ধের মূল ত্রুটি তাঁর চোখে উল্টো প্রতিভাত হতো না, সমালোচনাটির দক্ষিণঘেঁষা দুর্বলতাকে ট্রট্স্কিমার্কা প্রতিক্রিয়াশীলতা বলে ভুল করতেন না। আমাদের সকল প্রগতিপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি ও সমালোচনা প্রচেষ্টার মধ্যে এই বামপন্থী বৈধর্মের পরিচয়, নিজ শ্রেণী-মূল-গত মোহ ও ভ্রান্তির নাগপাশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবার অক্ষমতার প্রমাণ, কমবেশি আছে—কিন্তু সেটা কোনমতেই উগ্র বামত্বের ট্রট্স্কিমার্কা প্রতিক্রিয়াশীলতা হয়ে উঠতে পারে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অচিন্ত্যকুমার প্রসঙ্গে নীহারবাবু শিককাবাব ও সন্দেশে গুলিয়ে ফেলেননি। তিনি যে মূল কথাটা ধরতে পারেননি তা হলো এই যে, মানিক বা অচিন্ত্য একজনও ভালো শিকক্বাবাব বা সন্দেশ বানাচ্ছেন না। নীহারবাবুর মার্ক্সিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি কাঁচা বলেই 'গায়েন' ও 'মুচিবায়েন'-এর তুলনামূলক পার্থক্যটাই তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে, আজকের দিনের জীবনের গতির সঙ্গে বাস্তব ও সত্যধর্মী সামঞ্জস্য রাখার যে প্রগতিশীল 'সৎপ্রচেষ্টা'টুকু 'গায়েন' গল্পে তাঁর চোখে পড়েছে তাতেই তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। সেই পুরাতন ফাঁকি রসসৃষ্টির খাতিরে, 'মুচিবায়েন'-এ আজকের দিনের চাষাভুষো, সবার জীবনের

প্রথম ও প্রধান সত্য, আড়ালে রয়ে গিয়েছে বলে তাঁর কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ‘গায়েন’-এর আপেক্ষিক সাহিত্যিক সার্থকতা। এবং এ হিসাবে কথাটা সত্যই। প্রগতির প্রচেষ্টাতে খুশি হওয়া বরং ভালো, প্রচেষ্টার অভাবকে বরণ করার প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মচ্যুতির চেয়ে। চাষাভুষো নিয়ে গল্প লিখবো বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্য, যারা দেহরক্ষার ব্যাপার অনেকটা সহজ করে মন নিয়ে কারবার করার অবসর পায়, এবং ওই অবসর-সোহাগী মনের খাতিরে একেবারে চেপে যাব চাষাভুষো পুরুষটা ও নারীটার অবসরহীন অকথ্য কঠোর দেহরক্ষার সংগ্রাম, অথচ রসসৃষ্টি করবো, একমাত্র ওই দুটি ভুখা দেহের যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে—সাহিত্যসৃষ্টির এ ফাঁকি আজ অচল না হয়ে গেলেও ধরা পড়ে গিয়েছে। চাষীমজুরদের দেহ নিয়ে সাহিত্যের হাটে এ ব্যবসা চালানোর সহজ সরল মানেই হলো, পশুপাখীর প্রেমলীলা দর্শনে যে মনের বিকার তৃপ্ত হয়, সাহিত্যের পর্যায়ে তুলে সেই মনের বিকারকেই তৃপ্তিদান। ‘মুচিবায়েন’ সত্যিই তাই অশ্লীল। সত্যিই অবান্তর। অনাথপিণ্ডদসুতার একমাত্র বস্ত্রদানের ফলে যে অশ্লীলতা গুরুদাসবাবু কল্পনা করেছিলেন, সেটা গুরুদাসবাবুরই শ্লীলতা অশ্লালতা সম্পর্কে চেতনার প্রশ্ন—চাষীমজুর মেয়ে বৌয়ের গা থেকে একমাত্র ছেঁড়া কাপড়খানা কেড়ে নেওয়ার অশ্লীলতার সঙ্গে তার আকাশ পাতাল তফাত। দেহ তো আর অশ্লীল নয়, দেহের চেতনাও নয়—ঐ চেতনার বিকৃতিই শুধু অশ্লীলতা। গোর্কি বেঁচে থাকলে

আচমকা আসরে টেনে নামানোর চমক সামলে, সবিনয়ে বিষ্ণুবাবুকে এই দৃষ্টিতে আরেকবার শোলোকভের উপন্যাসটি পড়বার অনুরোধ জানাতেন নিশ্চয়। 'কম্যুনিস্ট ও কসাকদের দুর্বলতা বা যৌন আত্মদানেই শেষ'—কিন্তু এই শেষটাই আসল বা বইখানার শেষ কথা নয়। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় যৌন সম্পর্কের বিপর্যয় সম্পর্কে 'হিউম্যানিটি আপরুটেড্' বইখানার নিরপেক্ষ পর্যালোচনা পড়ে দেখলেও বিষ্ণুবাবুর সাহায্য হতে পারে, খেয়াল হতে পারে যে, যৌন বিপর্যয়েরও একটা বিপ্লবাত্মক সত্য থাকে—বিপ্লবটা বাদ দিলে যা অর্থহীন। কম্যুনিস্ট ও কসাকদের যৌন আত্মদানই শোলোকভের উপন্যাসটির প্রধান কথা বা মর্মকথা নয়—যদিও বিষ্ণুবাবু তাই ধরে নিয়েছেন। এবং ধরে নেওয়ার ফলে, তিনিই গোর্কিকে প্রতিক্রিয়াশীলতার পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছেন—নীহারবাবু নন। তাই কি দাঁড়ায় না কথাটা ?—শোলোকভের উপন্যাসে কম্যুনিস্ট ও কসাকদের দুর্বলতা বা যৌন আত্মদান ছাড়া আর কিছুই ছিল না—তবু শুধু আর্টের খাতিরে গোর্কি বইখানা ছাপিয়ে ছিলেন! এই যদি 'আর্ট', এবং একেই যদি এতটা খাতির গোর্কি করে থাকেন, তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল বলতেই হবে। 'একটা মানুষ জন্মালো' গল্পে অশ্লীলতার দ্বারপথে পুঁজ রক্তের সঙ্গে মানুষের জন্মলাভের বর্ণনাটাই "মনে হয়" বিষ্ণুবাবুর মতে "যেন" গোর্কির গল্পটির একমাত্র সার্থকতা—আর্টত্ব।

বিষ্ণুবাবুর মার্ক্‌সিস্ট জ্ঞান যে কতদূর অপরিচ্ছন্ন তার

আরেক প্রমাণ, লেখা থেকে লেখককে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার যুক্তির মধ্যে পাই। "অচিন্ত্যকুমার হাকিম কিনা তা জানবার প্রয়োজন গল্প সমালোচনায় নেই, তিনি কৃষকসভার রিপোর্ট থেকে গল্প লেখেন কিনা তাও জানবার প্রয়োজন নেই।" অর্থাৎ শুধু লেখার বিচার করো, লেখককে বাদ দিয়ে। লেখা যেন আকাশ থেকে পড়ে—লেখক সম্পর্কে কিছুই না জেনে যেন লেখার সমালোচনা সম্ভব ! শোলোকভ বা গোর্কির জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায় না বাংলাদেশে তা যেন না জানলেও চলে সমালোচকের। অচিন্ত্যকুমারের কলম কেন অনেকদিন থেমে ছিল, কেন আবার পূর্ববঙ্গের চাষীদের নিয়ে বিশেষ ধরনের গল্পের ফসলের আশ্চর্য ফলন শুরু হলো ! কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে দু'তিনখানা গল্পের বই দান করলেন, বাংলা সাহিত্যে যা সম্পূর্ণ নতুন প্রচেষ্টা, কোন্ সূত্রে এই নতুন উপাদানের সন্ধান তিনি পেলেন, আইন আদালত তাঁর সাম্প্রতিক গল্পে কেন এতটা প্রাধান্য পেলো, এ সব না জেনেই যেন তার গল্পের সঠিক সমালোচনা সম্ভব ! প্রকৃতপক্ষে, বিষ্ণুবাবু এখানে 'আর্টের জন্যই আর্ট'-এর পক্ষেই একটু ঘুরিয়ে ওকালতি করেছেন। মার্ক্সবাদের মূলকথা উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, লেখকের শ্রেণীগত চেতনার হিসাব না ধরেও লেখার বিচার চলে, লেখক কোন শ্রেণীর দৃষ্টিতে চাষীশ্রেণীর জীবনকে দেখছেন, গল্পের সমালোচনায় তার খোঁজ করা গোয়েন্দাগিরির সামিল !

কিন্তু প্রগতিশীল-সমালোচনা, গালাগালি বা দুর্নামের ভয়ে লেখককে ছেড়ে কথা কইতে রাজী নয়, সংগ্রামী বাঙালীর সংস্কৃতির লাল রাস্তা কে তৈরি করেছে আর কিসে তৈরি হয়েছে সে বিষয়ে উদাসীন থেকে, তরল দীপ্তির চটুল আগুনে সমাজ-চেতনার ফুলঝুরির মোহে, সাহিত্যিক স্পেশাল পাওয়ার্সের খেলা চলতে দিতে রাজী নয়। কৃষকসভার রিপোর্ট থেকে যিনি গল্প লেখেন তাঁকেও নয়। কলকাতায় বসে যিনি 'গায়েন' লেখেন, হাকিমের আসনে বসে যিনি 'মুচিবায়েন' লেখেন, মার্ক্‌সবাদ নিয়ে যিনি ঘরে বসে কাব্য করেন তাঁদেরও নয়!

সংগ্রামী বাঙালীর সংস্কৃতির লাল রাস্তা তৈরি করতে হলে সংগ্রামী সমালোচনা ছাড়া চলবে কেন? পুরানো সংস্কৃতির ধাঁধাকে সাদরে বজায় রেখে নতুন সংস্কৃতি গড়া যায় না।

হেমিংওয়ের বিশেষ পরিণতির সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের বিশেষ পরিণতির তুলনাকে, হেমিংওয়ের সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের তুলনা বলে ভুল করে, নীহারবাবু গজেন্দ্রগামিনী মহিলাকে হাতি মনে করার মতো 'বাজিকর সমালোচকে' পরিণত হয়েছেন! নীহারবাবুর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে বোঝা অসম্ভব 'পার্থক্য'টা তাঁর খেয়াল ছিল কিনা। তিনিই সেটা জানেন। তবে তাঁর মন্তব্য থেকে ধরে নিলে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন না। হেমিংওয়ের সঙ্গেই তিনি অচিন্ত্যকুমারের তুলনা করার

অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু এতই কি ভুল একটা কথা তিনি বলে ফেলেছেন? বিশেষ পরিণতি কি এমনই একটা ছাঁকা জিনিস যা বিচ্ছিন্ন করে এনে তুলনা করা যায়? হেমিংওয়ের এবং অচিন্ত্যকুমারের মধ্যে আর সমস্ত তুলনা বাদ দিয়ে শুধু তুলনা করা যায় তাঁদের বিশেষ পরিণতির? কিসের ভিত্তিতে সে তুলনা হবে? নির্গুণ, নিরপেক্ষ তুলনা, 'abstract'-এর অঙ্গীকার যে মার্কসীয় ধারণা প্রণালীতে অর্থহীন, বিষ্ণুবাবু নিজেই তার পরিচয় দিয়েছেন হেমিংওয়ের বিশেষ পরিণতির সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের বিশেষ পরিণতির তুলনা করতে গিয়েই। 'ভয়াবহ মিতভাষিত্বের' প্রচণ্ড সার্থকতা লাভ, স্পেনের ফ্যাসিস্ট যুদ্ধ, দুর্গত-সমাজ-ভাঙা অত্যাচারে অনাচারে জর্জর বাংলা, দেশজ শব্দের তীক্ষ্ণ মর্যাদালাভ, সস্তা কারুণ্য থেকে মুক্তি, বিষয়ানুগ মানবিকতা ইত্যাদি ফর্ম ও কন্টেন্টগত সর্বাঙ্গীনতার মধ্যেই তাঁকে পরিণতির ভিত্তি খুঁজতে হয়েছে। দু'জনের পরিণতির তুলনার অর্থই তাই দু'জনের রচনাবলীর তুলনা এবং চেতনা ও দৃষ্টির পরিবর্তনের তুলনাও।

শেষ কথাটা মনে রাখেন না বলেই সাহিত্যিকের বিশেষ পরিণতি সম্পর্কে বিষ্ণুবাবুর ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, অচিন্ত্যকুমারের চাকুরিয়া বা মধ্যবিত্তকে নিয়ে লেখা গল্প ও চাষীজীবনের গল্পের স্টাইলের পার্থক্যের ভুল ব্যাখা দিতে হয় এবং ওই পার্থক্যের মধ্যেই বিশেষ পরিণতি আবিষ্কার করে উৎফুল্ল হন। মধ্যবিত্ত বা চাকুরিয়াদের নিয়ে

লেখা-গল্পের "প্রখর ব্যঙ্গ ও প্রায় নেতিবাচক অবজ্ঞা" ওই শ্রেণীরই আত্মবিরোধের প্রকাশ, অচিন্ত্যবাবু নিজেও যে আত্মবিরোধের অংশীদার। চাষী জীবনের সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ নেই, চাষী জীবন তাঁর কাছে শুধু দর্শনীয় ও বুদ্ধি-মননীয় ব্যাপার, সুতরাং চাষী জীবনের গল্পে ব্যঙ্গ ও অবজ্ঞার সেই তীব্র করুণ প্রকাশ ঘটবে কি করে? এ ক্ষেত্রে ব্যঙ্গের চেহারা চাষী জীবনকে বিকৃত করায়, অবজ্ঞার স্ফূর্তি চাষীজীবনের দীনতাকে হীন করায়। তেভাগা আন্দোলনটা নাই বা এল গল্পে, একজন বাজনদারের বৌ দিলোই বা তার দেহটা আর এক বাজনদারকে ঘুষ। কিন্তু তেভাগা আন্দোলনের মধ্যে সমগ্র চাষী জীবনের যে সত্যটা প্রকাশ পেলো, মুখ বুজে অত্যাচার সয়ে না গিয়ে চাষী মেয়ে পুরুষ আজ সচেতনভাবে সংগ্রাম করে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, এই সত্যকে গল্পের মধ্যে কোন্ আর্টের ধামায় চাপা দেওয়া চলবে? এ তো শুধু তেভাগার প্রশ্ন নয়, এটাই চাষী জীবন, এটাই তার চেতনা—এবং জীবনে তার সহস্র আত্মপ্রকাশ! গল্পে বাজনদারের বৌ শতবার দেহ ঘুষ দিক—বাংলার চাষাভুষোর শত শত বৌ বাস্তবে তা দিয়েছে এবং দিচ্ছে, কিন্তু গল্প কি হবে ওইটুকুই? এ কি মধ্যবিত্তের ঘরের বৌয়ের দেহ ঘুষ দেওয়া যে, শুধু নীতিবোধের ধর্ষণেই করুণ রস সৃষ্টি হবে? চাষী বৌ নিজের দেহকে পণ্য করলে চাষীর জীবনের বাস্তবতাতেই খুঁজতে হবে তার মর্ম, তাতেই ফুটবে তার করুণ রূপ। নতুবা হবে অশ্লীলতা, ন্যাচারালিজম্।

আমরা ভদ্রলোকেরা বলি : আহা, গরীবের বৌ অভাবের তাড়নায় দেহ বিক্রি করলো! আমাদের ভাবখানা এই, যেন আমাদের আহা বলবার জন্যই সে এ কাজটা করেছে, অন্যথা কোন প্রয়োজনই ছিল না।

এই জন্যই লেখা থেকে লেখককে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বিষ্ণুবাবু যদি এই অমার্ক্সীয় দৃষ্টি বর্জন করতেন, তাহলে দেখতে পেতেন, অচিন্ত্যকুমারের যে বিশেষ পরিণতির কথা বলছেন তার বিশেষত্ব, নতুন দৃষ্টি, নতুন চেতনা, নতুন জীবনবোধ বা মানসজগতের সমাজমানসগত মৌলিক কোন পরিবর্তন নয়—পরিণতি শুধু এই যে, তিনি নতুন বিষয়কে উপাদান করে আরও পাকা হাতে লিখছেন। তাঁর আগের স্টাইল আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে, তাঁর আগের দৃষ্টি আরও ব্যাপক, জীবনক্ষেত্রকে আরও পরিষ্কারভাবে দেখছে, অভিজ্ঞতার সাহিত্যিক রূপায়ণ আরও ঘন ও শৃংখলাবদ্ধ হয়েছে। তাঁর চিন্তাজগতে বিপ্লবাত্মক কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। মধ্যবিত্তের জীবন একদিন ছিল তাঁর সাহিত্যের অবলম্বন। তারপর চাকরি জীবনে চাষীর জীবন, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের মুসলমান চাষীর জীবন, একভাবে তাঁর সামনে এল, একদিকের উলঙ্গ বাস্তবরূপে। ত্রিশংকু শ্রেণীর স্বপ্ন ও বাস্তবে একাকার অর্থহীনতা, ভ্রান্তি, বিরোধ ও ব্যর্থতা, এক কথায় সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ মধ্যবিত্ত জীবনের আত্মবিচারগত বাস্তবতা যেভাবে তাঁর সাহিত্যে এসেছিল, তেমনিভাবেই এল চাষীর জীবনের

বাস্তবতা। তফাত শুধু হল এই যে, চাষীর রিক্ততা তাঁর চোখে মূল্য পেলো মধ্যবিত্তের ব্যর্থতায়, জমির ট্র্যাজেডি, অনাচার অত্যাচারের মর্ম রূপান্তরিত হতে লাগল মানসিক দ্বন্দ্বে। তাদের সঙ্গে স্বভাবতঃই দেশজ শব্দ এল এবং লাভ করলো অচিন্ত্যকুমারেরই নিজস্ব তীক্ষ্ণতা।

হেমিংওয়ের পরিণতির সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের পরিণতির তুলনা করতে হলে, আগে তাই দরকার হয় এই দৃষ্টিতে হেমিংওয়ের পরিণতি এবং অচিন্ত্যকুমারের পরিণতির বিচার। অচিন্ত্যকুমার ভালো গল্প লিখতেন। আজ আরও ভালো গল্প লিখছেন। তাঁর পূর্ণতর বিকাশ হয়েছে। বিকাশ পরিবর্তন নয়। ধারা পরিপুষ্ট হওয়া ধারাবাহিকতাই। সমাজ ভাঙা জর্জর বাংলার চাষীজীবনের আসল বাস্তবতা কোথায় তাঁর সাহিত্যে? কোথায় বাঁচার সংগ্রাম, যা তাদের হাসিকান্না আনন্দবেদনা প্রেমবিরহ নীতিদুর্নীতি কলহবিবাদ একতা প্রতিরোধ—জীবনের সমস্ত অভিব্যক্তিকে প্রভাবান্বিত করেছে?

প্রগতিশীল সমালোচনা, কাঁচা সমালোচনা পর্যন্ত, আজ তাই প্রথমেই খোঁজ করে সৃষ্ট-সাহিত্য জীবনের এই সর্বাধিক সত্য, বাস্তবতার এই প্রধান সর্ত, সংগ্রামকে স্বীকার করেছে কিনা। তার মানে এই নয় যে, সমালোচক সৃষ্ট-সাহিত্যের সার্থকতা বিচারের একমাত্র মাপকাঠি বেঁধে দিয়েছেন—রণভূমির সম্মুখ যুদ্ধের প্রাথমিক অঙ্গীকার, চাষী লাঠি নিয়ে জমির জন্য লড়ছে মরছে—শুধু এই হবে চাষী জীবনের গল্পের উপজীব্য, এরকম হুকুম জারি করেছেন। প্রগতিবাদী

এটুকু জানে যে, তাতে সংগ্রামকেই মিথ্যা ঘোষণা করা হয়। চাষীর জীবনে, জনসাধারণের জীবনে, অত্যাচারী শক্তির সঙ্গে সামনাসামনি সংঘর্ষ ছাড়া সংগ্রামের আর কোন রূপ নেই, অভিব্যক্তি নেই,—এ তো সংগ্রামকেই অস্বীকার করা, সাময়িক একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনায় পরিণত করা। জীবনে ও চেতনায় ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে বলেই সংগ্রাম সত্য। চাষী শুধু তেভাগা করে না আজ, সে নিজেই ভাবে আর বলে, আগের মতো বৌকে মারধোর করা চলবে না। মন্দির মসজিদ পুরুত মোল্লার কাছে আজও সে মাথা নোয়ায়, কিন্তু তেমন আর অভিভূত হয় না। কবিয়ালের মুখে রামায়ণের যুদ্ধ বা কুরুক্ষেত্রের গানের বদলে আজকের মানুষের মুক্তি-লড়ায়ের গানে তার রোমাঞ্চ হয় বেশি। তার প্রেম, বাৎসল্য, ঘৃণা লজ্জা ভয় ক্রোধ আজ মাটির নরম সহিষ্ণুতায় গড়া নয়, তাতে কাস্তের কাঠিন্য ও ধার আছে।

বাংলার চাষী গরীবদের জীবন সাহিত্যগত করার দায়িত্ব সোজা নয়। বিষ্ণুবাবু যদি তাঁর "প্রগতিবিলাসী বন্ধুদের" সঙ্গে এ দায়িত্ব পালনের সৎপ্রচেষ্টায় যোগ দিতেন তা হলে তাঁর কাছে ধরা পড়তো, এ বিলাস কি কঠিন কষ্টসাধ্য ব্যাপার! সাহিত্যপাঠের সহক্ষমতা শুধু নয়, মিলেমিশে নিজেদের চেতনা পুনর্গঠনের, আত্মকেন্দ্রিকতা, ভ্রান্তি, সংস্কার ও সংকীর্ণতা অপনোদনের, এবং আরও অনেক কিছুর জন্য কি বিরামহীন অনলস সংঘবদ্ধ সাধনা চলছে! "শ্রদ্ধা বিনয় আর সততা এবং অনলস অধ্যয়নের দ্বারা আমরা

সবাই যেন সাহিত্যের প্রগতি প্রসারেই সাহায্য করতে পারি, দলগত মনোভাবে নয়”—বিষ্ণুবাবু এ আশা করতে পারেন বলে আমাদের কম মুস্কিল নয়। কারণ তিনি আমাদের বন্ধু মানুষ। /মুস্কিল একটা নয়। কী ও কাকে শ্রদ্ধা করবো? জনসাধারণকে, না জনসাধারণ থেকে বিচ্যুত জনসাধারণের সংজ্ঞা-মূল্য-নির্ধারণকারীকে ও তাঁর সংজ্ঞা-মূল্যকে? কোন্ বিনয় অভ্যাস করবো? মানবতা-বিচ্যুত আধ্যাত্মিক বিনয়, অথবা জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও উচ্চতা যা ঘুচিয়ে দেয় সেই বিনয়? কোন্ সততাকে মর্যাদা দেবো? জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রতীক আমার শ্রেণীর প্রতি যে সততা, অথবা আমাদের চেয়ে জনসাধারণ বড়, এই সততা? অনলস অধ্যয়ন চালাবো কিসের এবং কি উদ্দেশ্যে? বই পড়ে বিদ্যার জাহাজ হতে, না বই পড়তে পড়তে জনসাধারণের জীবনে নেমে গিয়ে জীবনকে জানতে? |

সাধে কি আমরা শ্রদ্ধা আর বিনয়, সততা এবং অনলস অধ্যয়নের দুটো দুটো মানের মধ্যে, ব্যক্তিগত মানে বাদ দিয়ে ব্যাপক জীবনের ব্যাপক মানে গ্রহণ করেছি! নইলে শুধু মানের ধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে প্রাণ যায়!

এই আমাদের দলগত মনোভাব। এই আমাদের স্বজাতিপ্রীতি। দুটো দল, হয়ে গিয়েছে, উপায় কি! ব্যক্তিগতদের ব্যক্তিপ্রীতির দল এবং জনসাধারণের নৈর্ব্যক্তিক স্বজাতিপ্রীতির দল। দ্বিতীয় দলে গত না হলে প্রগতি হয় না।

প্রগতি সাহিত্য

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয়। দীর্ঘ চার বছর পরে বর্তমান চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। দুটি সম্মেলনের মধ্যে এই দীর্ঘ ব্যবধান ঘটার প্রধান কারণ আমাদের অর্থাৎ সংঘের পরিচালকদের দুর্বলতা। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পক্ষে এরূপ সম্মেলনের গুরুত্ব আমরা সঠিক অনুভব করতে পারিনি, এবং এই অক্ষমতা এসেছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির আদর্শগত অনচ্ছতা থেকে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বাস্তব অবস্থা সম্মেলন আহ্বান করার অতিশয় প্রতিকূল ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রচণ্ড আঘাতে ও বঙ্গবিভাগের ফলে আমাদের সংগঠন একরকম ভেঙে যায়। শাখাগুলির সঙ্গে কেন্দ্রের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। বহু শাখার অস্তিত্ব লোপ পায়। কেন্দ্রের কার্যকলাপও বহুদিন বন্ধ রাখতে হয়। এ আঘাত সামলে উঠতে না উঠতে শুরু হয়ে যায় প্রতিক্রিয়ার হিংস্র আক্রমণ।

বাস্তব বাধা ও অসুবিধাগুলির গুরুত্ব কিছুমাত্র অস্বীকার না করেও বলা যায়, এই সব বাধা ও অসুবিধা অতিক্রম করে অনেক আগেই আন্দোলনের আয়োজন করা অসম্ভব ছিল না। দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য কেবল ১৯৪৬ সালে

সম্মেলন সম্ভব ছিল না, পরের বছর সম্মেলন আহ্বান করা যেতো। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪৭ সালে সম্মেলন ডাকা সম্পর্কে আলোচনা ও প্রাথমিক পরিকল্পনা স্থির হয়—সংঘের সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বুলেটিনে বাংলা শাখার রিপোর্টে এই পরিকল্পনার উল্লেখ আছে। প্রতিক্রিয়ার সরকারী ও বেসরকারী আক্রমণও এতদিন সম্মেলন না ডাকার অনিবার্য কারণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। প্রতিক্রিয়ার বেসরকারী আর্তনাদ এখন তীক্ষ্ণতর, এবং সরকারী দমননীতি তীব্রতর হয়েছে এবং আমরা এই সম্মেলনের আয়োজনও করেছি।

সুতরাং সম্মেলন এই ১৯৪৯-এ পিছিয়ে আনার প্রধান দায়িত্ব সংঘের পরিচালকমণ্ডলীর। বলা বাহুল্য, যুগ্মসম্পাদক দু'জন এ বিষয় সকলের চেয়ে বেশি দায়ী।

আজ এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আমাদের অন্যান্য ভুলভ্রান্তির মতো এই নিষ্ক্রিয়তার মূল উৎস হচ্ছে, বর্তমান জগতের বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের দ্বিধা-সংশয়হীন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। আদর্শগত দ্বিধাসংশয় দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল শক্তির বিরাট অভ্যুত্থান সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আমরা প্রগতির ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে এনেছি সত্য, কিন্তু এগিয়েছি আমরা দ্বিধাগ্রস্তভাবে, বাস্তবতার দ্রুত রূপান্তরের অনেকখানি পিছনে পিছনে।

আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয় করতে, সত্যোপলব্ধির আলোতে আজকের দিনে প্রগতিশীল শিল্পী ও সাহিত্যিকদের লক্ষ্য কি, কর্তব্য কি, এ বিষয়ে দ্বিধাহীন, আপোষহীন শাণিত তীক্ষ্ণ আহ্বান, সংঘ দিতে পারেনি।

সংঘের গত কয়েক বছরের ইতিহাস সমগ্র দৃষ্টিতে বিচার করলে এই দুর্বলতার সুস্পষ্ট চেহারা এবং এই দুর্বলতা সত্ত্বেও, প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও আন্দোলনের অভূতপূর্ব প্রসার আমাদের কাছে ধরা পড়ে।

যুদ্ধের সময় সংঘের ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনের প্রসার লাভ ও শক্তিশালী বৃহৎ সংগঠন গড়ে ওঠা, বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে সংঘটিত হয়। এই সাফল্যের একটি বিশেষ তাৎপর্য আজ আমাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে সংঘের কেন্দ্রীয় শাখার সভ্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৭৫ জন—এক বছরের মধ্যে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৪২ জন; সংঘের শাখা ছিল মাত্র ২টি, বাংলার বিভিন্ন জেলায় সক্রিয় ১৪টি শাখা গড়ে ওঠে।

কেন্দ্র ও শাখাগুলির মোট সভ্যসংখ্যা হাজারের উপরে উঠে যায়। কলিকাতা ও মফঃস্বলে বহু সাংস্কৃতিক সভা, শিল্প-সাহিত্য ও সমাজ-জীবনের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা, পুস্তক প্রকাশ, লাইব্রেরী পরিচালনা প্রভৃতি নানা কাজের মধ্যে আন্দোলন অসাধারণ শক্তি সঞ্চয় করে।

কেবল বাংলায় নয়, সারা ভারতে ফ্যাসি-বিরোধী

আন্দোলনের মধ্যে সংঘের সর্বভারতীয় বিরাট সংগঠন গড়ে ওঠে।

এই অসাধারণ সাফল্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, আদর্শ ও আন্দোলন সম্পর্কিত একটি সহজ সত্যই আরেকবার প্রমাণিত হয়েছিল এই সাফল্যের মধ্যে যে, আদর্শ ও সংগঠন পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। আদর্শে খুঁত থাকবে, অথচ সংগঠন নিখুঁত হবে, বা সংগঠনে খুঁত রেখেও নিখুঁত আদর্শ সার্থক হবে, এটা অসম্ভব। আদর্শ ও সংগঠন বা আন্দোলন পরস্পরের পরিপোষক ও পরিপূরক ; অবিচ্ছিন্ন, অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সমাজ-জীবন ও শিল্প-সাহিত্যের সম্পর্কে মার্ক্সিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি কি তখন আমাদের নিখুঁত ছিল ? আজকের চেয়ে পরিষ্কার ধারণা ছিল শিল্পী ও সাহিত্যিকের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে ? তা নয়, দৃষ্টি তখন আমাদের অনেকখানি ঝাপ্সাই ছিল, আদর্শগত সমগ্রতার দিক থেকে।

কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে, পৃথিবীব্যাপী সংকটের সীমাবদ্ধ বাস্তবতায় আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল নির্ভুল। সোভিয়েটের নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী সংগ্রাম চলার সময় প্রগতিবাদী শিল্পী ও সাহিত্যিকের একমাত্র কর্তব্য সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল—তার সবটুকু সৃজনীশক্তি দ্বিধাহীন চিত্তে ফ্যাসিবাদের উচ্ছেদ সাধনে প্রয়োগ করা।

অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় ১৯৪৫ সালে তৃতীয় বার্ষিক

সম্মেলনে, ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ নাম পরিবর্তন করে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ নাম রাখা হয়। পরিবর্তিত অবস্থায় আমাদের আদর্শগত সামগ্রিক ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন ক্রমে ক্রমে জরুরী হয়ে ওঠে। শিল্প ও সাহিত্যের ফর্ম কন্টেন্ট থেকে শুরু করে সামাজিক ভূমিকা পর্যন্ত নানা বিষয়ে, এত প্রশ্ন ও সংশয়ের সম্মুখীন আমাদের হতে হয় যে, মার্ক্সবাদের বিজ্ঞানসম্মত বিচারের ভিত্তিতে প্রগতি আন্দোলনের নির্ভুল ও সর্বাঙ্গীন আদর্শ স্থির করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

এই চেতনার তাগিদে, সংঘের বিভিন্ন সভার ও সাপ্তাহিক বুধবারের বৈঠকে এবং 'পরিচয়' ও অন্যান্য প্রগতিবাদী পত্রিকায়, বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রবন্ধের মাধ্যমে সঠিক মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। শিল্পী সাহিত্যিক ও সংঘের অন্যান্য সভ্যদের বড় একটি অংশের মধ্যে আদর্শের দিকটা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা গড়ে তোলার জন্য বিশেষ আগ্রহ এবং উৎসাহ দেখা যায়। দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমবিকাশের সঙ্গে এই আগ্রহ ও উৎসাহ। অন্যদিকে, দৃষ্টিভঙ্গিকে সাফ করার এই আন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্যে বুর্জোয়া মনোবৃত্তি সম্পন্ন সুবিধাবাদী কিছু কিছু শিল্পী সাহিত্যিকের মানসিক দৈন্য প্রকট হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে সংঘ থেকে সরে গিয়ে এঁরা প্রগতি-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

শিল্প ও সাহিত্যের থিয়োরীর দিকটা সম্পর্কে আমাদের

এই ঝোঁক, অপ্রয়োজনীয় বুদ্ধিবিলাস ছিল না, এদিকে আরও বেশি সক্রিয়তা ও উৎসাহেরই বরং প্রয়োজন ছিল। আর্ট ও সমাজ সম্পর্কে সঠিক মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার এই অভিযানের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এক নিষ্ঠুর সত্য—বিদেশী শাসক কত যত্ন আর অধ্যবসায়ের সঙ্গে তার পদানত দেশের মানুষগুলির চিন্তাজগতে, পুরনো মৃত যুগের কত বিভ্রান্তির জঞ্জালকে, কত অন্ধ সংস্কারকে জীইয়ে রাখে—স্বাধীন দেশে কালের গতির সঙ্গে আপনা থেকে যা ধুয়ে মুছে যায়।

আমাদের মানসজগতের ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণে সযত্নে রক্ষা করা বহু সংস্কার ও বিশ্বাসের মূলগুলি উপড়ে ফেলার জন্য, থিয়োরী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার অফুরন্ত প্রয়োজন আছে। আমাদের ত্রুটি এদিকে ঘটেনি, আমাদের ভুল হয়েছে অন্যদিকে। দেশে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার দ্রুত রূপান্তর সম্পর্কে একেবারে উদাসীন না থাকলেও, এদিকে যতখানি মনোযোগ দেওয়া, এই বাস্তবতাকে যতখানি গুরুত্ব দেওয়া একান্তভাবে জরুরী ছিল, আমরা তা দিইনি। আমাদের গলদ থেকে গিয়েছিল—প্রতি পদক্ষেপে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে না দিলে আদর্শগত বিভ্রান্তি বা মোহ থেকে যে মুক্ত থাকা যায় না—এই সহজ সত্যের উপলব্ধিতে।

শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকা এবং সোভিয়েটের নেতৃত্বে জগতে ধনতন্ত্রের অবসান ও নূতন

সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, এদেশে বুর্জোয়া শ্রেণীর, প্রগতিশীল ভূমিকা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার শিবিরে যোগদান —এই সব সত্যকে সচেতনভাবে গ্রহণ করেও, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সব সত্যের বাস্তব অভিব্যক্তি যে এক হওয়া উচিত, সে বিষয়ে আমাদের বিভ্রান্তি থেকে গিয়েছিল। সমস্ত জগৎ দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যে তার প্রতিফলন ঘটবে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার একইরূপ আপোষহীন সংঘাতের মধ্যে, প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে চেপে মারার বহুরূপী প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন অভিযান প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকবে—এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন হতে পারিনি।

আমরা তাই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পুরনো ধারার জের টেনে এসেছি। শ্রমিক ও বিপ্লবী জনসাধারণের নূতন সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে এগোতে এগোতেও বজায় রাখতে চেয়েছি বুর্জোয়া জগতের সঙ্গে ভাবগত আত্মীয়তা। আমরা যে সচেতনভাবে, সক্রিয়ভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী জনসাধারণের পক্ষে, সোভিয়েটের পক্ষে,—দৃঢ় কণ্ঠে একথা ঘোষণা করতে আমরা ইতস্তত করেছি।

সংঘ এদিকে যেমন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মধ্যে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বজায় রেখে অগ্রসর হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি এই দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয়ও দিয়ে এসেছে।

দাঙ্গাহাঙ্গামা যখন প্রচণ্ডতম হয়ে দাঁড়ায়, তখন কিছুদিন ছাড়া সংঘ কোনদিনই নিষ্ক্রিয় থাকেনি। সংঘের সাধারণ নিয়মিত কাজের মধ্যে সোমেন চন্দ লাইব্রেরী ও পাঠাগার পরিচালনা, এবং বুধবারের বৈঠক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী বক্তা পাঠাবার ব্যবস্থাও সংঘ বরাবর করে এসেছে। দাঙ্গার সময়, সংঘের উদ্যোগে ও পরিচালনায় শিল্পী ও সাহিত্যিকদের বিরাট দাঙ্গা-বিরোধী অভিযান গঠন এবং শ্রমিকশ্রেণীর দাঙ্গা-বিরোধী চেতনাকে শিল্পে সাহিত্যে, চিত্র ও রচনার মধ্যে রূপায়ণ, এবং শিল্পী সাহিত্যিকদের ঐক্যবদ্ধ সভা ও শোভাযাত্রায় সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি দেওয়া, আমাদের সংঘের পক্ষেই সম্ভব ছিল। এই সময় (১৯৪৬) বঙ্গীয় সংস্কৃতি পরিষদ স্থাপনের প্রচেষ্টা করা হয়। অপর দিকে ১৯৪৭-এর পনেরোই আগস্ট ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে, সর্বদলীয় শিল্পী সাহিত্যিকদের সাংস্কৃতিক ঐক্যমূল্য দিতে বিরাট সভার অনুষ্ঠান করে, শ্রেণীস্বার্থে বিভক্ত জগতে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবাস্তব ও অসম্ভব সর্বদলীয় ঐক্যের প্রতি মোহের পরিচয়ও সংঘ দিয়েছিল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দুটি বিরোধী ধারাও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে, রাজনীতির ক্ষেত্রে তথাকথিত স্বাধীনতা পাওয়া সম্পর্কে শ্রমিক ও জনসাধারণের মোহভঙ্গের প্রতিক্রিয়া শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই দুটি ধারায় বিরোধীরূপ,—প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল রূপ—প্রকট হয়ে

ওঠে। 'আর্ট ফর আর্ট্‌স সেক'-এর পন্থী শিল্পী ও সাহিত্যিকের নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী কয়েকজন নামকরা ব্যক্তির সঙ্গে, সংঘের প্রগতিবাদী সভ্যদের মতের সংঘাত তীব্র হয়ে ওঠে। সংঘ দৃঢ়তার সঙ্গে এই ভ্রান্তমতের বিরোধিতা করে। প্রগতিবিরোধী এই সাহিত্যিকেরা সংঘ থেকে সরে গিয়ে সংঘকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে নিন্দা ও মিথ্যাপ্রচারের অভিযান শুরু করেন।

প্রকৃতপক্ষে, প্রগতিবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বিভিন্ন "সাংস্কৃতিক" পত্রিকা এবং প্রতিক্রিয়াশীল লেখকদের সংগঠন এই সময় আমাদের সংঘের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করে।

আমাদের সংঘের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে স্থাপিত 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' সক্রিয় হতে চেষ্টা করে। কিন্তু মৃত সংস্কৃতির জের টেনে প্রগতিশীল নূতন ও জীবন্ত সংস্কৃতির বিরোধিতায় নামার অর্থই, ভাব ও প্রেরণার অসীম দৈন্য— এই দৈন্য নিয়ে কোন সংঘ প্রাণবান ও সক্রিয় হতে পারে না। 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' তাই বারবার মাথা তুলতে চেয়ে ঝিমিয়ে গিয়েছে।

আমাদের সংঘ সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই আক্রমণের প্রতিরোধ করেছে—'পরিচয়' এবং অন্যান্য প্রগতিবাদী পত্রিকার সাহায্যে এবং সাংস্কৃতির অনুষ্ঠান প্রভৃতির আয়োজন করে। প্রগতিশীল মতবাদের প্রচারে 'পরিচয়'-এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে

প্রগতি-বিরোধী ধারা প্রবল হবার পর 'পরিচয়'-এর সম্পাদকীয় নীতির যে পরিবর্তন করা হয়, এবং যে দৃঢ়তার সঙ্গে এ নীতি অনুসরণ করা হয় তা বিশেষ অভিনন্দনের যোগ্য।

বিরোধীপক্ষের প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের সংঘ প্রশংসনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু প্রতিরোধ গড়ে তুলবার সক্রিয় প্রচেষ্টা সম্পর্কে সংঘ সম্পূর্ণ সচেতন হতে পারেনি। বুর্জোয়া ভাবধারার মোহ সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে না পারায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতির ধারা আজ কতদূর শক্তিশালী—সংঘের পুরোপুরি সে ধারণা জন্মায়নি, এবং এই শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ রূপ দেবার দায়িত্ব পালনে উদাসীনতা থেকে গিয়েছে। বর্তমান যুগে শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের বিপ্লবী চেতনা যখন যতদূর অগ্রসর হয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ধারার ততখানি শক্তিশালী হবার সম্ভাবনাও সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয়ে যায়। বাংলার শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নূতন সংস্কৃতির দুর্বার জোয়ার আনার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়ে আছে বহুমুখী বিক্ষিপ্ত প্রগতিশীল ধারাগুলির মধ্যে। আমরাই গাফিলতি করে এতদিন ধারাগুলিকে একত্র করে জোয়ার সৃষ্টি করতে পারিনি।

গত এক বৎসর প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ, নিন্দা ও অপপ্রচারের স্তর অতিক্রম করে, প্রগতিশীল লেখক, শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারী নির্যাতনের স্তরে পৌঁচেছে। সংঘের বিশিষ্ট সভ্য শ্রীগোপাল হালদার,

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় আজ বহুদিন বিনা বিচারে আটক হয়ে আছেন। সংঘের কেন্দ্রীয় আপিসে একাধিকবার পুলিসের পদার্পণ ঘটেছে, কয়েকটি শাখায় সার্চ করে উৎসাহী কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান গণনাট্য সংঘ এবং সোভিয়েট সুহৃদ সংঘও পুলিসের কৃপালাভ থেকে বঞ্চিত হয়নি।

এই আক্রমণের প্রতিরোধে সংঘের উদ্যোগে 'সংস্কৃতি স্বাধীনতা পরিষদ' স্থাপিত হয়। বুদ্ধিজীবীদের সামনে সংস্কৃতির এই নতুন সংকটের স্বরূপ তুলে ধরা ও জোরালো প্রতিবাদ সৃষ্টি করার কাজে 'সংস্কৃতি স্বাধীনতা পরিষদে'র ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যুদ্ধাবসানের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবস্থার দ্রুত রূপান্তর হয়েছে। আজ সোভিয়েটের বিরুদ্ধে আমেরিকার নেতৃত্বাধীনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে নূতন বিশ্বযুদ্ধের প্রকাশ্য প্রচারের রূপ নিয়েছে। এই সোভিয়েট বিরোধিতা রাজনীতির ক্ষেত্র অতিক্রম করে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ফ্যাসিস্ট দমননীতিতে পরিণত হতে আরম্ভ করেছে। তাই, যেটুকু মোহ ও জড়তা অবশিষ্ট ছিল আজ তা ঝেড়ে ফেলবার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

সন্দেহ নেই আমরা তা পারবো। প্রগতির অভিযান সকল বাধা ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে যাবে।

বাংলায় ভারতীয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের একটি হিন্দী ও একটি উর্দু শাখা আছে। এই শাখা দুটির সঙ্গে

এতদিন আমাদের প্রায় কোন যোগাযোগই ছিল না, অল্পদিন হয় এঁদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। তাই এই প্রতিষ্ঠান দুটির নাম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হতে হচ্ছে।

বহু প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান, পত্রিকা ও ব্যক্তির কাছ থেকে প্রগতি লেখক ও শিল্পীসংঘ নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছে। আমরা সহযাত্রী, আমাদের মধ্যে ঋণ স্বীকার ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যবধানটুকুও আমরা রাখতে চাই না। [২২-৪-৪৯]

বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা

পৌষ, ১৩৫৩ সংখ্যা "পরিচয়ে" প্রকাশিত "বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধটি আমি সমগ্রভাবে প্রত্যাহার করছি। এদেশে শ্রেণী সংগ্রামের বর্তমান পর্যায় সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী প্রাপ্ত ধারণার ফলেই তার জন্ম।

এরূপ প্রত্যাহার ঘোষণার প্রয়োজন হবে ভাবিনি। আমার ধারণা ছিল নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল বিষয়টি সমগ্রভাবে পুনর্বিবেচনাসাপেক্ষ এবং এ লেখাটিও বাতিল বলে বিবেচিত হবে। প্রশ্নটা সামগ্রিক বিচারের, সুতরাং গুরুতর ভুল সত্ত্বেও কোন লেখায় কোন্ কোন্ সঠিক কথা বলা হয়েছে সেটা তুলে ধরবার চেষ্টা নিরর্থক এবং অনুচিত। সব কিছু বাতিল হোক বা না হোক, সব কিছুই নতুনভাবে বিচার করতে হবে। আনুষঙ্গিক বা আংশিক সত্য যদি বলা হয়ে থাকে, তার স্থান হবে ভুলভ্রান্তি সংশোধন করা ও নতুনভাবে বিচারের ভিত্তিতে লেখা প্রবন্ধে।

দেখা যাচ্ছে, অনেকের ধারণা এই যে, আমি এখনও উপরোক্ত প্রবন্ধের মতামত আঁকড়ে আছি। পুনর্বিবেচনার জন্য তাই এই প্রত্যাহার ঘোষণার প্রয়োজন হলো।

আমার এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে ফাল্গুনের "পরিচয়ে" সিতাংশুবাবুর আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। লেখাটি

মার্ক্সবাদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা পদ্ধতিকে, বৈঠকী তার্কিকের যেন-তেন-প্রকারেণ বিপক্ষকে (?) ঘায়েল করার স্তরে নামিয়ে আনার একটি নিদর্শন বলে মনে হয়েছে। লেখাটি নিয়ে বিশদ আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। আমি শুধু লেখাটির প্রথম প্যারাটির বিচার করবো, এবং ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক দু'-একটি অপ্রাসঙ্গিক অভিযোগের জবাব দেবো। কোন লেখার প্রথম প্যারা থেকেই যদি প্রমাণ করা যায় যে, সমালোচক তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধটি ভালো করে না পড়েই মার্ক্সবাদের উদ্ধৃতি-ভূষিত আলোচনাটি লিখে ফেলেছেন, তখন সমস্ত লেখাটি নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন থাকে কি ?

ঐতিহ্য সম্পর্কে আমার একটি মত ছিল, রবীন্দ্র গুপ্ত ঐতিহ্য বিচারের যে নতুন 'ভিত্তি' সরবরাহ করেন, আমি সেটা গ্রহণ করি। এই প্রসঙ্গে আমার আগের মতটা কি ছিল তার বিবরণ আমার প্রবন্ধে দাখিল করি। "আমার মতটা কি ছিল এবং কিভাবে আমি রবীন্দ্র গুপ্তের মত গ্রহণ করেছি একটু বলা দরকার।" [পরিচয়, পৌষ, পৃঃ ৩৬]

সিতাংশুবাবুকে পায় কে! নতুন মত গ্রহণের আগে আমার পুরনো মত কি ছিল তার বিবরণ থেকে উদ্ধৃতি তুলে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, আমি কেমন নতুন একটা মত মেনে নিয়েও তার বিরোধী কথা লিখছি!

আরও আছে, প্রথম প্যারাতেই আছে। প্যারার শুরুতেই সিতাংশুবাবু লিখেছেন যে, আমি "প্রকাশ রায়ের

বক্তব্য রবীন্দ্র গুপ্তের লেখা” পড়ার পর মেনে নিয়েছি। এটা আংশিক সত্য অবলম্বন করে একটা মিথ্যাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা। আমার প্রবন্ধে কি কোনরূপ অস্পষ্টতা আছে যে, শুধু ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রকাশ রায়ের মতটা রবীন্দ্র গুপ্তের মতের ভিত্তিতে মেনে নিয়েছিলাম? প্রবন্ধের গোড়াতেই নম্বর দিয়ে লিস্ট দাখিল করেছি, প্রকাশ রায়ের কোন্ কোন্ বক্তব্য সম্পর্কে আমার কি বক্তব্য ছিল—এবং নম্বর (২নং বক্তব্য) উল্লেখ করে স্পষ্টই বলেছি যে, রবীন্দ্র গুপ্তের লেখা পড়ে কেবল ঐতিহ্য সম্পর্কে আমার মত বদলেছি। প্রকাশ রায়ের লেখাকে রবীন্দ্র গুপ্ত মোটামুটিভাবে সমর্থন করেন—আমি তা করিনি। প্রকাশ রায়ের খণ্ডিত দৃষ্টি, বামপন্থী বিচ্যুতি না দেখা, যান্ত্রিকতা, প্রভৃতির যে সমালোচনা আমার প্রবন্ধে আছে, সেটা কি তার বক্তব্যকে মেনে নেওয়ার প্রমাণ?

সিতাংশুবাবু অভিযোগ করেছেন: “এই সম্পর্কে মানিকবাবু গত প্রগতি সাহিত্য-সম্মেলনের ইস্তাহার রচনা নিয়েও কতগুলি কথা বলেছেন, যেগুলি সেই সম্মেলনের ইস্তাহার পুনর্লিখন কমিটির সভ্য হিসাবে তাঁর বলা ঠিক হয়েছে কিনা তাঁকে ভেবে দেখতে বলি।”

(পরিচয়, ফাল্গুন, পৃঃ ৪৯)

অর্থাৎ সিতাংশুবাবু বলতে চান, কমিটির সভায় কিচ্ছু না বলে পরে আমার প্রবন্ধে ইস্তাহারটির নিন্দা করা ঠিক হয়নি। কমিটির সভ্য হিসাবে পুনর্লিখিত ইস্তাহার সম্পর্কে

আমার দায়িত্ব ভুলে গিয়েছি। নিজেকে বাঁচিয়ে অন্যদের নিন্দা করা আমার অন্যায় হয়েছে।

এও আরেকটা প্রমাণ যে, সিতাংশুবাবু আমার প্রবন্ধটি ভালো করে না পড়েই সমালোচনা করেছেন। ইস্তাহারটি সম্পর্কে কাকে বা কাদের কটাক্ষ করা হয়েছে আমার প্রবন্ধে? কোথায় অস্বীকার করেছি আমার দায়িত্ব? ইস্তাহারটি মনের মতো না হলেও সেটি গ্রহণযোগ্য বলার জন্য, ভালো একটি ইস্তাহার লেখার অক্ষমতার জন্য শুধু আমাকেই বরং আমি খোঁচা দিয়েছি। নিন্দা করেছি, "প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক ও সম্মেলনের কার্যকরী সভাপতি"কে [পরিচয়, পৌষ, পৃঃ ৪৫]। ইস্তাহার পুনর্লিখন কমিটির সভার বিবরণ স্মরণ আছে, কিন্তু আমিই যে ছিলাম সংঘের সম্পাদক ও সম্মেলনের কার্যকরী সভাপতি, সেটা আজ স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে সিতাংশুবাবুকে।

ইস্তাহার পুনর্লিখন কমিটির উল্লেখ আমার প্রবন্ধে নেই। উল্লেখ করলে এ স্বীকৃতিও অবশ্যই থাকতো যে, আমিও ওই কমিটির সভ্য ছিলাম।

৫১ পৃষ্ঠায় [পরিচয়, ফাল্গুন সংখ্যা] সিতাংশুবাবু লিখেছেন : "মানিকবাবুকে আশ্বাস দিচ্ছি তাঁকে শ্রমিক হতে হবে না, কেননা শ্রমিক হলেই সাহিত্য লেখা যায় না।"

শ্রেণী-সম্পর্ক, শ্রেণী-বিচ্যুতি, শ্রেণী-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে আমি যা বলিনি তাই আমার বক্তব্য বলে, এবং আমি যা বলেছি সেটা বিকৃত করে উপস্থিত করেছেন,

তাই কি যথেষ্ট ছিল না ? এ ব্যক্তিগত মিথ্যা আক্রমণ কেন ? আমি শ্রমিক হতে অনিচ্ছুক, এ নির্লজ্জ ঘোষণা তো আমার লেখায় কোথাও নেই ! আমার লেখায় বরং শ্রমিকশ্রেণীকেই ষোল আনা বিপ্লবী, সেরা মানুষ বলে অভিনন্দিত করা হয়েছে।

মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ থেকে চয়ন করে নয়, সিতাংশুবাবু নিজে আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন ! অথচ শ্রমিক শব্দের মানেই তিনি জানেন না। তাই তিনি নির্বিবাদে ঘোষণা করেছেন, জগতের শ্রমিকশ্রেণীর নেতা স্টালিনও শ্রমিক নন !

বুঝতে পারা যায় যান্ত্রিক অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি সিতাংশুবাবুকে কোন্ ধাঁধায় ফেলেছে : কারখানায় না খেটে কি করে শ্রমিক হওয়া যায় ? শ্রমিক না হয়েও শ্রমিকশ্রেণীর নেতা হওয়া সম্ভব, যেমন স্টালিন, কিন্তু কারখানায় না খাটলে শ্রমিক হবে কোন্ যুক্তিতে ?

সিতাংশুবাবু নিজেই এ সমস্যার মীমাংসা করতে পারেন। শ্রমিকশ্রেণীর বন্ধু আছেন, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ, সংগ্রাম ও চেতনা ষোল আনা নিজের করে নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর একজন হয়ে পড়ুন। দেখবেন, কারখানার মারফতে ছাড়া এভাবেও শ্রমিক হওয়া যায়—শ্রমিকশ্রেণীর একজন হওয়ার যুক্তিতে।

